হৃদয় গলে সিরিজের অষ্টম উপহার

অশ্রুভেজা কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

সূচীপত্র

অশ্রুভেজা কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ (ফার্স্ট ক্লাশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ফাযেল, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১।
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদরাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

সম্পাদনায়

মাওলানা বশীর উদ্দীন

মাওলানা আনোয়ারুল হক

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কওমী মাদরাসা পাবলিকেশন্স
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

অশ্রুভেজা কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবা ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন ঃ ৭১২৫৪৬২,

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর - ২০০৪ইং
রজব - ১৪২৫ হিঃ

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১০০০।

মূল্য
একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ রাশেদুল হক (টিটু)
মাইক্রো কম্পিউটার প্রিন্টিং
সদর রোড, বাজীর মোড়, নরসিংদী।
ফোন : ০৬২৮-৬৪০৯৬, মোবা : ০১৮৯-৮০৬৮৯৬

www.smfoundationbd.com

.... আল-ইহদা ....

পরম শ্রদ্ধেয় দাদীজানের

দরজা বুলন্দি ও মাগফিরাত কামনায়–

আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু

অর্পন করলাম।

--- লেখক।

www.smfoundationbd.com

জাতির কান্ডারী মুজাহিদে মিল্লাত, উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, আকাবিরে উম্মতের সুযোগ্য উত্তরসুরী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, উস্তাযুল আসাতিযা

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুযুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** (চলমান অংশের নাম 'অশ্রুভেজা কাহিনী) নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষনীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

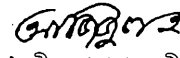

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ইং (শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস
হযরত মাওলনা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম তার **'যে গল্পে হৃদয় গলে"** (বর্তমান অংশের নাম 'অশ্রুভেজা কাহিনী') নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয় বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমিন।

১৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ইং

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম
আল্লামা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকূল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতীর নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানামতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুণ আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধিবিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযুগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহাম আল্লাহ ত'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের উসিলা বানান। আমীন।

(নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস নরসিংদী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব হযরত

মাওলানা মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত ও দোয়া

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াকাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদি হিল্লাযি নাসত্বাফা। আম্মাবাদ,

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। এতে কারো দ্বিমত নেই। গল্প-কাহিনী মানুষ শুনতে যেমন ভালবাসে, তেমনি পড়তেও ভালবাসে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কিংবা বৃদ্ধ-জোয়ানের ভেদাভেদ নেই। গল্পের প্রতি মানুষের এ স্বভাবগত ঝোঁকের কারণেই তারা গল্প পড়ে, শুনে এবং শুনানোর জন্য অন্যকে অনুরোধও করে। সুতরাং গল্পের বিষয়বস্তু যদি সুন্দর, ভাল ও চরিত্রগঠনমূলক হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, সৎ-সুন্দর ও উত্তম হবে। যা তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। **'যে গল্পে হৃদয় গলে'র** লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম অত্যন্ত রুচিশীল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় সে কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দ্বীনি খেদমতের জন্য আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

তৃতীয় খন্ডের পর এ বইয়ের বাকী গল্পগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার পরিকল্পনার কথা শুনতে পেরে সত্যিই আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে এবং তার মহৎ উদ্যোগকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা জাতির হোদায়েতের পথকে উন্মুক্ত করুন। আমীন।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং

(মাওলানা আলী আহমদ হোসাইনী)

প্রকাশকের কথা

সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহে **'হৃদয় গলে'** সিরিজের ৮ম খন্ডটিও অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি।

মানুষ স্বভাবগতভাবেই সাধারণতঃ গল্প-কাহিনী পড়ার প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে থাকে। এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে সাহিত্যাঙ্গনে গল্প-কাহিনী সমৃদ্ধ যেসব বই-পুস্তক রয়েছে, তাতে আমাদের শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক এবং প্রবীণদের শিক্ষার মতো তেমন কিছুই নেই। এসব বই-পুস্তক সাধারণত ভূত-পেত্নী ও দেব-দেবীর এমন সব উদ্ভট, কল্পনাপ্রসূত ও বানোয়াট কাহিনীতে ভরপুর, যা ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দান ছাড়া আর কিছুই দিতে সক্ষম হয় না।

তবে খুশির কথা এই যে, অধুনা এক ঝাঁক তরুণ আলিম, সত্য সুন্দর ও সৃজনশীল সাহিত্যের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইসলামী ভাবধারা ও নীতিমালার আলোকে কিছু গল্প-কাহিনী, সত্য ঘটনা ও বস্তুনিষ্ঠ উপদেশমূলক লিখনী জাতিকে উপহার দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যা সর্বস্তরের আপামর জনগণকে সাহিত্যের খোরাক দানের পাশাপাশি উন্নত চরিত্র গঠনপূর্বক আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। আমার জানা মতে **হৃদয় গলে সিরিজের** প্রতিটি বই মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই লেখা। এ সিরিজের প্রতিটি ঘটনা পাঠক-পাঠিকাদের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার জন্য অন্তহীন প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করুক- এ প্রত্যাশা নিয়েই ইসলামিয়া কুতুবখানার এ ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

অবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে একান্ত মুনাজাত, তিনি যেন আমাদের ক্ষুদ্র এ প্রয়াস কবুল করেন এবং একে সকলের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন। আমীন॥

বিনীত

তাং-০১/৯/০৪ইং

মোঃ মোস্তফা

www.smfoundationbd.com

পাঠকদের খেদমতে দু'টি জরুরি কথা

'হৃদয় গলে সিরিজ-০৮' এখন আপনাদের হাতে। মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহর অপরিসীম করুণা এবং আপনাদের আন্তরিক কামনা ও দোয়ার ফলেই উক্ত সিরিজের দ্রুত আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহকে জানাই লাখো-কোটি শুকরিয়া এবং আপনাদের প্রতি রইল প্রাণঢালা অভিনন্দন।

চলমান **'হৃদয় গলে'** সিরিজ প্রায় সমাপ্তির পথে। আপনাদের দোয়ায় আর মাত্র দু'টি বই (৯-১০) বের হলেই আপনাদের সাথে আমার কৃত ওয়াদা পালন হয়ে যাবে। আল্লাহ চাহে তো আগামী ২০০৫ সালের জানুয়ারীর শেষ নাগাদ বাকি বই দু'টো আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারব বলে আশা রাখছি। এরপর এ সিরিজ সামনে অগ্রসর হবে, নাকি এখানেই শেষ হয়ে যাবে তা নির্ভর করবে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত ও মূল্যবান পরামর্শের উপর।

এ পর্যায়ে এসে আপনাদের হয়তো জানতে ইচ্ছে করছে, এ ব্যাপারে লেখকের মতামত কি? সিরিজ-১০ বের হওয়ার পর তিনি কী করতে চান? তিনি কি নতুন কোনো বই বা সিরিজ লেখার পরিকল্পনা নিয়েছেন? হ্যাঁ, এসব উহ্য প্রশ্নের জবাবসহ আরো দু' একটি কথা বলার জন্যই আজ কলম হাতে নিয়েছি।

হৃদয় গলে সিরিজ-১০ পর্যন্ত পৌঁছার পর আমার ইচ্ছে ছিল, আরেকটি নতুন সিরিজ শুরু করব। যার নাম হবে **'সুখময় জীবন'** সিরিজ।

মানুষ সুখ চায়, শান্তি চায়। চায় সুখময় জীবন। কিন্তু সকলের কি এ আশা পূরণ হয়? সত্যিকার অর্থে সকলেই কি সুখের জীবন লাভ করতে পারে? সবাই কি জীবনে সফল হয়? না, হয় না। সবাই সুখময় জীবনের নাগাল পায় না। শান্তিময় জীবন ভাগ্যে জুটেনা।

এর কারণ কি? এর কারণ হিসেবে সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যা করলে, যা বললে কিংবা যা থেকে বিরত থাকলে শান্তির সুখের পায়রা আমাদের মুঠোয় আসতে বাধ্য হতো, পৌঁছতে পারতাম সফলতার স্বর্ণ শিখরে- তা আমরা ঠিকমত করছি না, বলছি না কিংবা বিরত থাকছি না। আর এ জন্য দায়ী হলো হয়তো আমাদের অজ্ঞতা, নয়তো যথাযথ গুরুত্বের অভাব। **'সুখময় জীবন'** সিরিজে মূলত অজ্ঞতা দূরীকরণ এবং আমলের প্রতি গুরুত্ব, সচেতনতা ও উৎসাহ সৃষ্টির কাজটিই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, ইনশাআল্লাহ। নতুন এ সিরিজে কি থাকবে, কেন থাকবে, কিভাবে থাকবে তা যদি একটু খুলে বলি, তবে বলতে হয়-

১. শুধু আখিরাত নয়, দুনিয়াতেও সুখ, শান্তি, সফলতা ও মধুময় জীবন লাভের জন্য একজন মানুষের যা কিছু পালন করা বা যা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন- এ সিরিজের মূল বিষয়বস্তু হবে তা-ই।

২. পয়েন্ট দিয়ে লেখা প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সত্যিকার অর্থেই পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়ার জন্য কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, বিখ্যাত বুজুর্গ ও মনীষীদের জীবনাচার, তাঁদের প্রসিদ্ধ উক্তি কিংবা বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে।

৩. তা ছাড়া মাঝে মধ্যে সুবিধাজনক স্থানে শিক্ষামূলক, আকর্ষণীয় ও মর্মস্পর্শী গল্প-কাহিনীতো থাকবেই।

৪. প্রতিটি বিষয়কে ছোট্ট শিরোনাম দিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে, যাতে সকলেই শিরোনাম পড়া মাত্র বুঝতে সক্ষম হন যে, উক্ত কাজটি তার করা উচিত, নাকি উচিত নয়।

৫. পাঠকদের আত্মিক প্রশান্তি ও মনের স্থিরতার জন্য প্রতিটি আলোচনা শেষে রেফারেন্স উল্লেখ করা হবে।

৬. ঈমান-আমল, আকিদা-বিশ্বাস, আদব-আখলাক, বিদআত-কুসংস্কার, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি-অর্থনীতি, সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি, জিহাদ-তাবলীগ, ঘরোয়া টিপস্ ও সুস্বাস্থ্যসহ আধুনিক-অত্যাধুনিক অসংখ্য বিষয়ের অতি প্রয়োজনীয় ও খুঁটিনাটি দিকগুলো স্থান পাবে এ সিরিজে।

৭. তাছাড়া প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা শেষে উক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা প্রাসঙ্গিক আলোচনা আমার লিখিত অন্যান্য বইয়ের কোথায় কোথায় আছে তাও পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

(এখানে একটি কথা পাঠকদের জানিয়ে রাখা উচিত যে, সিরিজের বইগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। তা হলো, একটি বইয়ের সাথে পরবর্তী বইয়ের যোগসূত্র। এ সব বইয়ে সাধারণত: বিভিন্ন ঘটনার ঘনঘটা থাকলেও মূল চরিত্র থাকে একটিই। তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় সবকিছু। সিরিজের এ বৈশিষ্ট্যের কারণে আমার বইগুলোকে সিরিজের বই বলা না গেলেও, যেহেতু একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই বইগুলো লিখিত এবং এ একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের আবেদনই প্রতিফলিত হয় প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় এবং সেই সূত্রেই একটি বইয়ের সাথে আরেকটি বইয়ের সু-সম্পর্ক পুরো মাত্রায় বিদ্যমান, তাই আমি তাকে সিরিজ নাম দিয়েছি। আশা করি এ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কারো কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়।)

যা হোক, এবার পাঠক-পাঠিকার খেদমতে আমার বিনীত আরজ- আপনারা দয়া করে অতি তাড়াতাড়ি নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর যে কোনো উপায়ে আমাকে

www.smfoundationbd.com

জানিয়ে বাধিত করবেন। এতে আমার পক্ষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে খুবই সুবিধে হবে।

১. আপনি কি চান **'হৃদয় গলে'** সিরিজ ১০-এ গিয়ে সমাপ্ত হোক এবং এরপর নতুন সিরিজ শুরু হোক?

২. যদি আপনার মতামত নতুন সিরিজের পক্ষে হয়, তবে তার নাম, বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনার পদ্ধতির ব্যাপারে আপনি কি আমার উপরে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে একমত? উল্লেখ্য যে, আমার মতামতের অংশ বিশেষের উপর আপনার কোনো মন্তব্য থাকলে তা যেমন নির্দ্বিধায় জানাবেন, ঠিক অনুরূপভাবে আপনার মতামত আমার মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত হলে তাও নিঃসংকোচে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের সকলের মতামতগুলো সিরিজ- ৯ ও ১০-এ **পাঠকের মতামত** বিভাগে প্রকাশ করব। আর সম্ভব হলে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথাটি সিরিজ-৯ অর্থাৎ যে গল্পে হৃদয় জুড়ে'র মধ্যেই উল্লেখ করে দিব।

৩. যদি আপনারা আমাকে উৎসাহ দেন এবং আমার মতের সাথে আপনাদের মতের মিল হয়, তবে **সুখময় জীবন** সিরিজের মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি খণ্ডের জন্য আলাদা আলাদা কিছু নামও নির্বাচন করে পাঠানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

৪. আপনার জানামতে আপনাদের এলাকায় কোন বিদআত, কুসংস্কার বা শরীয়ত বহির্ভূত কোন কার্যকলাপ চালু তাকলে তাও বিস্তারিত লিখে পাঠানোর আবেদন করছি। প্রয়োজনে দত্তপাড়া মাদ্‌রাসার ফতোয়া বিভাগ থেকে এসব বিষয়ের সঠিক সমাধান সংগ্রহ করে সিরিজের যে কোন বইয়ে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনার নির্বাচিত নামসমূহ থেকে ২/১টি নামও যদি গ্রহণযোগ্য হয় তবে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ লেখকের পক্ষ থেকে সামান্য উপহার সহ আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি আশা করি, জাতীর বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এ আবেদনে সাড়া দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।

সবশেষে শ্রদ্ধেয় প্রকাশক, সম্পাদক ও সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে এবং আমার মতো ক্ষুদ্র লেখকের বই সর্বস্তরের জনগণের জন্য হিদায়েতের অসিলা হোক-মহান আল্লাহর দরবারে এ দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

বিনীত

তাং- ১৫/০৮/০৪ইং।

মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

সূচীপত্র

হৃদয় গলে সিরিজের বই সমূহ

১। যে গল্পে হৃদয় গলে—১
২। যে গল্পে হৃদয় গলে—২
৩। যে গল্পে হৃদয় গলে—৩
৪। যে গল্পে অশ্রু ঝরে
৫। যে গল্প হৃদয় কাড়ে
৬। যদি এমন হতাম
৭। ঈমানদীপ্ত কাহিনী
৮। অশ্রুভেজা কাহিনী
৯। যে গল্পে হৃদয় জুড়ে
১০। যে গল্পে হৃদয় কাঁদে

অশ্রুভেজা কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

সূচীপত্র

অবিচল ঈমান ১৫
একটি মর্মান্তিক দৃশ্য ২৫
যদি পেতাম এমন শাসক ৩৩
এক ফোঁটা চোখের পানি ৪১
এরই নাম খাঁটি তওবা ৪৯
কবরের ভয়ংকর শাস্তি ৫৯
নামাজে অলসতার ভয়াবহ পরিণাম ৬৫
ব্যভিচারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ৬৯
এতিমের প্রতি ভালবাসা ৭২
পঁচিশে পঁচিশ ৭৬
কৃতজ্ঞতার উত্তম প্রতিদান ৮১
ওলীদের সাথে বেয়াদবীর মাশুল ৮৭
একটি মধুময় স্বপ্ন ও তার বাস্তবায়ন ৯১
হাদীস শুনার নযীরবিহীন আগ্রহ ৯৪
মজবুত ঈমানের অনুপম উদাহরণ ৯৯
পাঠকের মতামত ১০৫
হৃদয় গলে সিরিজ তাদের জন্য ১১২
একটি বিশেষ অনুরোধ ১১২

ঃ লেখকের সাথে সার্বিক যোগযোগের ঠিকানা ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী সদর।
মোবা : ০১৭২-৭৯২১৯৩, ফোন : ০৬২৮-৬২৫৪১

১

অবিচল ঈমান

মুসলমান সিংহের জাতি। প্রতিটি মুসলমানের ঈমান হবে ইস্পাত কঠিন। অনড়। অবিচল। জীবনের চরম সংকটময় পরিস্থিতিতেও সে যেমন মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা করবে, ঠিক তেমনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বীকৃতি দিবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রিসালতের। কোনো রক্ত চক্ষুর আস্ফালন কিংবা মৃত্যুভয় তাকে স্বীয় অবস্থান থেকে এতটুকু নড়াতে সক্ষম হবে না।

আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণ বিশেষ করে হযরত সাহাবায়ে-কেরামের জীবনে এ জাতীয় ঘটনার হাজারো নজির খুঁজে পাওয়া যায়। যা সত্যি বিস্ময়কর, মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক। সোনালী যুগের স্বর্ণ মানবদের সেইসব ঈমানদীপ্ত ঘটনা থেকে ছোট একটি ঘটনা এবার পাঠক ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি।

হিজরী নবম বর্ষ। চারদিকে ইসলামের জয়জয়কার। ইসলামের হেলালী নিশান পতপত করে উড়ছে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে। দলে দলে লোকজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে ইসলাম কবুল করছে। তাঁর হাতে হাত দিয়ে বাইআত হচ্ছে। পাপ-পঙ্কিলময় জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিচ্ছে ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। এমনিভাবে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে প্রতিনিয়ত।

ঠিক এমনি সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়সাল্লাম -এর দরবারে দু'জন লোক উপস্থিত হলো। এরা দূত। এদের হাতে মুসাইলামার পক্ষ থেকে প্রেরিত একখানা চিঠি। সুদূর নজ্‌দ এলাকা থেকে আগমন করেছে এরা।

মুসাইলামা একজন ভণ্ড নবী। নবুয়তের দাবিদার। বিভিন্ন কায়েদা-কৌশলে সে বেশ কিছু ভক্ত-অনুরক্ত সৃষ্টি করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আগমনকারী দূত দু'জন সে সব ভক্তবৃন্দেরই অন্তর্ভুক্ত।

এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন-

"আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের নিকট। পর সংবাদ, হে নবী! আপনার সাথে নবুয়তের কাজে আমাকেও শরিক করা হয়েছে। সুতরাং জমিনের অর্ধেক আমার আর অর্ধেক কুরাইশদের। তবে কুরাইশরা সীমালংঘনকারী ও বর্বর সম্প্রদায়।"

চিঠির প্রথম বাক্যটি শ্রবণ মাত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক চেহারায় একটি গভীর বেদনার কালো ছায়া মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল। চোখে মুখে তাঁর উদ্বিগ্নতা। ললাটে গভীর চিন্তা রেখা। তিনি ভাবছেন, আর কত যুদ্ধ করবেন তিনি! আর কত লড়াই করবেন? তিনি তো রহমতের নবী। শান্তির দূত। রক্তপাত তাঁর কাজ নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। পৃথিবীর দিকে দিকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর মূল কাজ। এ কাজে বাধা এলেই তাঁর সুন্দর ফুটফুটে চেহারাখানা মুহূর্তে কালো হয়ে যায়। বিমর্ষ হয়ে উঠে গোটা মুখমণ্ডল। এক সাগর চিন্তায় ডুবে যান। তাই রাসূল আজ দারুণ চিন্তিত। সীমাহীন উদ্বিগ্ন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টি এতক্ষণ নিচের দিকে ছিল। চিঠি পড়া শেষ হলে দূতদের দিকে তিনি চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর নূরানী চেহারায় একটা কাঠিন্যভাব সুস্পষ্ট। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চিঠির বক্তব্যের সাথে তোমরাও কি একমত?

তারা বলল, তিনি যা লিখেছেন আমরা তাই-ই বলি, তা-ই বিশ্বাস করি।

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারক আরো কঠিন হলো। তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। এক পর্যায়ে তাঁর চেহারা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! যদি তোমরা দূত না হতে তবে এক্ষুণিই তোমাদের শির মস্তক থেকে আলাদা করে দিতাম। এতটুকু বলেই তিনি থেমে গেলেন। আর কিছু বললেন না। একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর চিঠির জবাবে লিখে দিলেন-

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে মিথ্যাবাদী মুসাইলামার নিকট। হিদায়েতের অনুসারীর উপর আল্লাহর শান্তি। এ জমিন আল্লাহর। তিনি বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী বানান। তবে শুভ পরিণাম একমাত্র মুত্তাকীনদের জন্যই।"

শয়তানের দোসর মুসাইলামা। সে কি আর হিদায়েতের বাণী শুনে? সে দেখেছে, নবী দাবি করে কিছু অন্ধ ভক্ত তৈরি করতে পারার ব্যবসাটা বেশ ভালই জমে উঠেছে। এখন আর রুটি-রুজির চিন্তা করতে হয় না। খেদমতের জন্য আলাদা লোক রাখারও প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং এমন একটা সুযোগ কি সে সহজে হাতছাড়া করতে পারে? তাই সে তার কার্যক্রম বন্ধ করল না। ফলে দিনে দিনে তার অনুসারীর দল বেড়েই চলল। মিথ্যা নবুয়তের বিষবৃক্ষের শিকড় দূরে, বহুদূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

এ সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম- এর কানে আসার পর তিনি আর নীরব থাকতে পারলেন না। তাঁর ধৈর্যের সীমা শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হলো। তাই তিনি শেষ বারের মতো পত্র পাঠিয়ে তাকে সতর্ক করে দেওয়ার চিন্তা করলেন।

কিন্তু কাকে পাঠাবেন? দূতিয়ালীর এ দায়িত্বটি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য চাই বুদ্ধি, সাহস ও দূরদর্শিতা। এমন কে আছে? রাসূলের চিন্তার ঘোড়াটি ছুটে চলল মদীনার ঘরে ঘরে। খুঁজে ফিরল পথে-প্রান্তরে, মাঠে-ময়দানে, পল্লীতে-পল্লীতে। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত তিনি পেয়েও গেলেন।

হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবী। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেই নির্বাচন করলেন। কেননা, উক্ত সাহাবী যেমন সুদর্শন, সাহসী ও বুদ্ধিমান তেমনি ঈমানী বলে বলীয়ান। ঠিক যেন মু'মিনের জীবন্ত প্রতীক। বাস্তব নিদর্শন। এ মহান দায়িত্বের জন্য তিনিই সর্বাধিক উপযুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ চিঠি নিয়ে ছুটে চললেন হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.)। তিনি একা। সফর সঙ্গী কেউ নেই। দুস্তর মরু কান্তার পাড়ি দিয়ে পাহাড় পর্বতের দুর্গম বাধা ডিঙ্গিয়ে তিনি নজদের বনূ হানিফ গোত্রে গিয়ে পৌঁছলেন। সোজা চলে গেলেন মুসাইলামার নিকট। হাতে তাঁর রাসূলের চিঠি।

চিঠি পড়েই মুসাইলামার চেহারায় মরুঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিল। হিংসা আর জিঘাংসার বিদ্যুৎ যেন বারবার চমকাচ্ছে তার গোটা মুখমণ্ডলে। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। রাগে সে অধীর হয়ে অনুগত অনুচরদের চিৎকার দিয়ে বলল, যাও, একে বন্দী করে রাখ। আগামী কাল দরবারে নিয়ে আসবে।

'মদীনার দূত বন্দী, আগামীকাল তার বিচার'-কথাটি অল্প সময়ের মধ্যে গোটা কবিলায় ছড়িয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, বহু রং ও চমকের মিশ্রণ ঘটে সংবাদটি আরো আকর্ষণীয়, আরো মোহনীয় হয়ে উঠল। এ সংবাদে মুসাইলামার অনুচররা দারুণ খুশি। আগামীকালের নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় সকলেই অধীর। নানা মুখে নানা জল্পনা-কল্পনা। যেন এর শেষ নেই। শুরুও নেই।

সকাল বেলা। বিচার মজলিশ। মুসাইলামা তার কারুকার্য খচিত জমকালো আসনে উপবিষ্ট। দু'পাশে তার অন্ধ অনুচর আর ভক্তদের ভিড়। দর্শক জনতার সংখ্যাও কম নয়। সাহাবী হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.) মুসাইলামার সম্মুখে দণ্ডায়মান। গোটা কক্ষে পিনপতন নীরবতা। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.) যেন সিংহ পুরুষ। তাঁর চেহারায় কোনো ভয়-ভীতির আভাস নেই। সুন্দর দীপ্তিময় চেহারায় যেন নূর চমকাচ্ছে। গাম্ভীর্যের ছাপ তাঁর গোটা

অবয়বে সুস্পষ্ট। শৃঙ্খলিত অবস্থায় বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছেন সকলের মাঝে। কথা বলছেন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে।

মুসাইলামা : তুমি কি মনে কর যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল?

হাবীব : হ্যাঁ, আমি কেবল মনেই করি না, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

মুসাইলামা : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল।

এ কথা শুনা মাত্র হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.) -এর শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁত কটমট করে বললেন, গর্দভ বলে কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর? কোন সাহসে তুমি এত বড় কথা বলতে পারলে? মনে রেখো, আমার মুখ দিয়ে কখনোই তুমি এ কথার স্বীকৃতি আদায় করতে পারবে না। সুতরাং তোমার এ অপবিত্র নাপাক কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা বল।

মুসাইলামার সামনে দাঁড়িয়ে একজন বন্দী এমন কড়া কথা বলতে পারবে, উপস্থিত কেউই তা কল্পনা করতে পারেনি। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বারবার তাকাতে থাকে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.)-এর দিকে।

মুসাইলামা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। দু'চোখে তার ঝরে পড়ছে সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে। দাঁতে অধর দংশন করে সে চিৎকার করে বলে-

জানো, আমার দরবারে বেআদবির পরিণাম কি?

হাবীব : বেআদবি আমি করিনি। বরং তুমিই করেছ। রাসূল হওয়ার দাবি করে তুমি যে পাপ করেছ, কয়েক বার হত্যা করলেও তোমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

মুসাইলামা : তাই নাকি? তার ভয়ঙ্কর মুখে ফুটে উঠে এক পৈশাচিক হাসি।

হাবীব : আমি একটুও মিথ্যা বলিনি। মনে রেখো, আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয়ও করি না। তোমার এ লম্ফঝম্ফ আর রক্ত চক্ষুকে আমি মোটেও পরোয়া করি না।

মুসাইলামা : তুমি হয়তো জান না, কোথায় দাঁড়িয়েছ।

হাবীব : আমি ভাল করেই জানি যে, ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার এক পাপিষ্ঠের সামনে আমি দণ্ডায়মান।

মুসাইলামা : জল্লাদ!

জ্বি হুজুর। নির্দেশ দিন। জল্লাদ এগিয়ে আসে।

মুসাইলামা : এ নরাধমের একটি অঙ্গ এক আঘাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল।

সাথে সাথে জল্লাদের নিষ্ঠুর আঘাতে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদের একটি অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে পড়ে গেল। দর দর করে নেমে এল রক্তের ধারা।

কিন্তু হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.) অনড়, অবিচল। যেন তাঁর কিছুই হয়নি। ইস্পাত কঠিন তার ঈমান। সে ঈমানের নূরে জ্বল জ্বল করছে তাঁর নয়ন তারা। সুমিষ্ট হাসির ঝলমলে রেখা লেগেই আছে তাঁর ঠোঁটের কোণে। যেন হেসে হেসেই তিরস্কার-বাণে জর্জরিত করছেন মিথ্যাবাদী মুসাইলামার নির্দয় অন্তর।

মুসাইলামা আবার প্রশ্ন করল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল?

: হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-আল্লাহর রাসূল।

: তুমি কি বিশ্বাস কর, আমি আল্লাহর রাসূল?

এ প্রশ্নটি শোনার সাথে সাথে আবারও হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.) -এর সুন্দর মুখমণ্ডল রাগে রক্তাভ হয়ে উঠে। তিনি কঠিন কণ্ঠে জবাব দিয়ে বলেন- 'আমি তো আগেই বলেছি, তোমার ঐ নাপাক কথাগুলো দূরে রাখ। কিছু জানার খাহেশ থাকলে অন্য কিছু জিজ্ঞেস কর।'

মুসাইলামার চোখ দু'টো পুনরায় আগুনের ভাটার মতো জ্বলে উঠে। দাঁতে দাঁত পিষে সে। দ্রুত নিঃশ্বাসের দরুন প্রশস্ত বক্ষ বারবার উঠানামা করে। দক্ষিণ হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয় তার। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে উষ্ঠাধর কামড়াতে থাকে। অবশেষে ক্ষিপ্ত-ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করে বলে-জল্লাদ! এ হতভাগার আরেকটি অঙ্গ কেটে ফেল।

জল্লাদ প্রস্তুত ছিল। সে নির্দেশ পালন করল। সাথে সাথে হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.)-এর পবিত্র দেহ থেকে আরেকটি অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। রক্তের ধারা বয়ে চলছে তাঁর শরীর থেকে। কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। নেই কোনো মনোযোগ। শাহাদতের অমিয় স্বাদে তিনি তখন বিভোর। হয়তো তাঁর দৃষ্টি তখন জান্নাতের হুর-গেলমান আর অনাবিল সুখের সন্ধানে অস্থির-ব্যতিব্যস্ত।

এমনিভাবে আরো কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। একদিকে ভণ্ড মুসাইলামা তার মিথ্যা নবুয়ত সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করে যাচ্ছে, আর অন্য দিকে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.) নির্ভীক চিত্তে জবাব দিয়ে চলছেন। কিন্তু কোনো জবাবই পাপিষ্ঠ মুসাইলামার মনঃপূত হচ্ছে না। তাই প্রতিটি জবাব শেষে নিষ্ঠুর মুসাইলামার নির্মম নির্দেশে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.)-এর এক একটি অঙ্গ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে ছিটকে পড়তে লাগল।

কিন্তু আর কতক্ষণ? প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.)-এর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নিস্তেজ হয়ে এলো তাঁর চোখের আলো। দুর্বল হয়ে গেল পা দু'টো। স্থির হয়ে যেতে লাগল তাঁর অঙ্গহীন দেহটি। এবার বিদায়ের পালা। মহা প্রভুর সাথে মিলনের শুভযাত্রা। ছুটে চললেন তিনি পরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। ছুটে চললেন চির শান্তির ও সুখের স্থান জান্নাত পানে। তাঁর ওষ্ঠাধর থেকে তখনো ক্ষীণ আওয়াজে উত্থিত হচ্ছিল-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। *

প্রিয় পাঠকবন্ধুগণ! আলোচ্য ঘটনায় একদিকে যেমন হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ (রা.)-এর মজবুত ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখেরী নবী হওয়ার বিষয়টিও পরিষ্কার বুঝা যায়। কেননা, তিনি যদি আখেরী নবী না হতেন, তাহলে মুসাইলামার চিঠি পেয়ে তাঁর রাগান্বিত হওয়ার কোনো

---

* ছুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা (৫ম খন্ড) # রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃষ্ঠা ৫১৪
# কিসরার মুকুট পৃষ্ঠা ৮৬

www.smfoundationbd.com

প্রয়োজন ছিল না। কারণ, একই সময়ে একাধিক নবী আসার রেওয়াজ পূর্ব থেকেই চালু ছিল।

খতমে নবুয়তের আকিদা অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কোনো নবী আসবেন না-এ কথার বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে অন্তরে ধারণ করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য। এ আকিদা পোষণ করা ছাড়া কোনো ব্যক্তি ঈমানদার হতে পারে না। কেননা, এ বিষয়টি একশ আয়াত ও দু'শরও বেশি হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তা ছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ও যুক্তিভিত্তিক অসংখ্য দলিল তো আছেই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্য হতে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। (সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরি করল এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করল। কিন্তু নির্মাণের সময় এক কোণে একটি ইটের জায়গা শূন্য ছিল। দালানের চতুর্দিকে লোকজন ঘুরে ঘুরে এর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলছিল, এ একটি ইট কেন সংযোজন করা হয়নি? (তাহলে ঘরের নির্মাণ কাজ পূর্ণাঙ্গ হতো) জেনে রেখো, আমিই সেই ইট বা শূন্যস্থান পূরণকারী এবং আমিই সর্বশেষ নবী। (অর্থাৎ আমার মাধ্যমে নবুয়তের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন এর মধ্যে এমন কোনো স্থান খালি নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য অন্য কোনো নবীর প্রয়োজন হবে)।*

কুরআন ও হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্যই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় দলিল। আর দীন ইসলামের যে বিষয়টির উপর সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হলো আক্বীদায়ে খতমে নবুয়ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের

---

* বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া # মুসলিম ফাযায়েল অধ্যায় (২য় খণ্ড) পৃষ্ঠা ২৪৮
# মুসনাদে আহমদ (২য় খণ্ড) পৃষ্ঠা ২৯৮।

www.smfoundationbd.com

পর যে সব দুরাত্মা মিথ্যা নবুয়তের দাবি করেছে, সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে আক্বীদায়ে খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ করেছেন।

উল্লিখিত ঘটনায় নবুয়তের দাবিদার মুসাইলামাতুল কায্যাব বা মিথ্যাবাদী মুসাইলামার কথা আলোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাকে জঘন্য মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে চিঠি প্রেরণ করেছেন। কিন্তু নবীজী এ সময় পরকালীন সফরের প্রস্তুতিতে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে, তাকে দমন করার জন্য কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রা.) ভণ্ড মুসাইলামাকে দমন করার জন্য হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর নেতৃত্বে ২৫ হাজার সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন।

এদিকে মুসাইলামাও ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়। ইয়ামামা নামক স্থানে উভয় দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলে মুসাইলামার ৮ হাজার অনুসারী নিহত হয়। বন্দী হয় কয়েক হাজার। অপরদিকে ৭০০ হাফিজে কুরআনসহ মোট ১২০০ সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হন।

নবীজীর জীবদ্দশায় ইসলামের জন্য সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে সর্বমোট যত সাহাবী শাহাদত বরণ করেন, খতমে নবুয়তের আকিদা সংরক্ষণের এ যুদ্ধে এর দ্বিগুণের কাছাকাছি সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, খতমে নবুয়তের আকিদা সংরক্ষিত না থাকলে ইসলামের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই এ আকিদা সংরক্ষণের জন্য তারা অধিকতর ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এ যুদ্ধ পরবর্তী কালের মুসলমানদের জন্য যে আদর্শ ও শিক্ষা পেশ করেছে তা হলো-

ক) খতমে নবুয়ত তথা 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কোনো নবী আসবে না'- এ কথার উপর সাহাবায়ে কেরামের উপর সর্ববৃহৎ ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খ) নবীজীর পর কোনো প্রকার নতুন নবীর আগমনের সম্ভাবনা নেই।

গ) এখন যে কেউ নবী, ছায়া নবী, স্বতন্ত্র নবী, সহায়ক নবী কিংবা উম্মতি নবীর দাবি করবে, সে নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, কাফির ও মুরতাদ।

ঘ) যে কোনো প্রকার নবুয়তের দাবিদারকে হত্যা করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

ঙ) নবুয়তের দাবিদারের দল যতই শক্তিশালী হোক না কেন প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ করে হলেও তাকে নির্মূল করতে হবে।

চ) সিংহাসনে যখনই কোনো দুরাচার উপবিষ্ট হবার চেষ্টা করবে তখনই বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে হলেও সে দুরাচারকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক এনায়েত করুন। আমীন॥

কুড়ানো মানিক

যে তোমার শত্রুতা করে তাকেও ভালবাসো। যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার জন্যও দোয়া করো। চেয়ে দেখো– সৃষ্টিকর্তা সূর্যের আলো ভাল-মন্দ সবার জন্যই অবারিত রেখেছেন। পাপী ও পুণ্যবান সকলের জন্যই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করছেন।

– হযরত আবু বকর (রাঃ)

২

একটি মর্মান্তিক দৃশ্য

অপরাধ : ওরা মুসলিম

মাওলানা জিয়াউল হাকীম। আরাকানের অধিবাসী। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি সপরিবারে হিজরত করে বাংলাদেশে চলে আসেন। কেন, কি কারণে, কি পরিস্থিতিতে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরাই এ কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস, এ ঘটনা পাঠ করে মুসলিম জাতির ঝিমিয়ে পড়া ঈমানী চেতনা কিছুটা হলেও শাণিত হবে।

ভোরের হাওয়া বইতে শুরু করছে। পাখির কলরবে মুখর হয়ে উঠছে ধরণী। দূরের কোনো মসজিদ থেকে ভেসে আসছে সুমিষ্ট কণ্ঠের সুমধুর আযানের ধ্বনি। বড় সুন্দর, বড় মোলায়েম সে সুর। মুসলিম অধ্যুষিত কুমারখালি এলাকার কন্দরে কন্দরে সেই সুরের আবেশ এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি হয় ---- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

মাওলানা জিয়াউল হাকীম ঘুম থেকে জেগেছেন বেশ আগেই। আযান শুনে মসজিদ অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছেন। পথিমধ্যে হঠাৎ দেখা হয় বার্মার মুফতীয়ে আজম মাওলানা সুলতান আহমদের সাথে। দু'জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, গলায় গলায় ভাব। তবে মাস খানেক যাবৎ একে অপরের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ নেই।

মুফতি সাহেবকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে মাওলানা জিয়াউল হাকীম যার পর নাই আনন্দিত হন। মোসাফাহা, মোয়ানাকা ও কুশল বিনিময়ের পর বিভিন্ন

বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে মসজিদ পানে তাদের পদযাত্রা অব্যাহত থাকে।

'জালিমদের অত্যাচার আর নিপীড়নের মাত্রা যে দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে'। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কথাটি বললেন মুফতি মাওলানা সুলতান আহমদ সাহেব।

'শুধু অত্যাচার আর নির্যাতনই নয়, কিছুদিনের মধ্যে তারা হয়ত আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও কেড়ে নেবে।' জবাবে বললেন মাওলানা জিয়াউল হাকীম।

: দিন দিন অবস্থার যা অবনতি ঘটছে তাতে এরূপ আশঙ্কা করা মোটেও অমূলক নয়।

: আচ্ছা মুফতি সাহেব! আমরা তো এ দেশেরে স্বাধীন নাগরিক। আমাদের কি অপরাধ যে, জালিমরা দিবা-নিশি অহর্নিশ আমাদের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাবে? কেন তারা আমাদের মা-বোনদের ইজ্জতের উপর হামলা করে? কেন, কেন এ জুলুম আমাদের উপর? বলতে বলতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

: মাওলানা! আমাদের কোনো অপরাধ নেই। আমাদের কেবল একটাই অপরাধ যে, আমরা মুসলমান। তারা চায় আমাদের উত্থানকে রুখে দিতে, স্তব্ধ করে দিতে চিরতরে।

ইতমধ্যে তারা মসজিদে চলে এসেছে। তাদেরকে দেখে তাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা নবী হোসেন অনেকটা দৌড়ে এসে বললেন-

মুফতি সাহেব! কিছু শুনেছেন কি?

: না, আমি কিছু শুনিনি তো? কি হয়েছে, ব্যাপার খুলে বলুন। মুফতি সাহেবের চেহারায় তখন ভয় ও আতঙ্কের ছাপ পরিস্ফুট।

: গতকাল আমরা কুমারখালি সেনা ক্যাম্প থেকে একটি হুকুমনামা পাই। তাতে লেখা ছিল-

"প্রত্যেক গ্রাম থেকে ১০জন যুবতী যাদের এখনো বিয়ে হয়নি তাদের পিতা যেন নিজ নিজ মেয়েদের নিয়ে অবিলম্বে কুমারখালি ক্যাম্পে উপস্থিত হয়।"

এতটুকু বলতেই মাওলানা নবী হোসেনের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

: হুকুমনামার সাথে আর কিছু ছিল কি? জিজ্ঞেস করলেন মাওলানা জিয়াউল হাকীম।

: হ্যাঁ, ছিল বৈ কি! ভয়ার্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন মাওলানা নবী হোসেন।

: কি ছিল সেটা? মুফতি সাহেবের প্রশ্ন।

: জালেমরা হুকুমনামার সাথে ১০জন মেয়ের একটি তালিকাও প্রদান করে। তালিকার নিচে লেখা আছে - "এসব মেয়েকে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৬ মাস মেয়াদী এ প্রশিক্ষণ কোর্সের সময় কোনো মেয়েকেই ক্যাম্পের বাইরে আসতে দেয়া হবে না। এমনকি কোন আত্মীয়-স্বজনও তাদের সাথে দেখা করতে পারবে না।"

এ কথা শুনে মাওলানা জিয়াউল হাকীম ও মুফতি সাহেব উভয়েই স্থির দৃষ্টি মেলে তাকালেন মাওলানা নবী হোসেনের দিকে। তারপর উভয়েই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন-

মুসলিম মেয়েদের ইজ্জত লুণ্ঠনের এ এক ভয়ানক অপকৌশল। আপনার কাছে তালিকাটি এখন আছে কি?

: হ্যাঁ, আছে। একথা বলে মাওলানা নবী হোসেন এক খণ্ড কাগজ পকেট থেকে বের করে মেলে ধরলেন উভয়ের সামনে।

মুফতি সাহেব প্রতিটি নাম একটু জোড়ে জোড়ে পাঠ করলেন। নাম পাঠের সময় মনে হচ্ছিল - তার হৃদয়ের সবগুলো তন্ত্রী যেন একত্রে ছিন্ন হয়ে যাবে। পড়া শেষ হলে মাওলানা জিয়াউল হাকীম এবং নবী হোসেনও ভয়ার্ত কণ্ঠে একত্রে আর্তনাদ করে উঠলেন। কারণ এ তালিকায় কুমারখালি এলাকার সাতজন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট আলিমের মেয়েদের নামের সাথে তাদের তিন জনের তিন যুবতী মেয়ের নামও ছিল।

তালিকার অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল-"যদি কোনো পিতা তার মেয়েকে না নিয়ে একাকী উপস্থিত হয়, তবে তাকে অবর্ণনীয় শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।"

এ ছিল আরাকানের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণকে মানসিকভাবে নির্যাতন ও তাদের ধর্মীয় চেতনার উপর আঘাত হানার পূর্ব-পরিকল্পিত এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। এর পূর্বে মানুষরূপী হায়েনাগুলো সুন্দরী যুবতী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যেত এবং কারিগরি শিক্ষার নাম দিয়ে লাইগেশনের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে লুটে নিত তাদের সযত্নে লালিত প্রিয় সম্ভ্রম। কুলষিত করত তাদের পবিত্র জীবনকে। তাই মেয়েদের সেনা ক্যাম্পে নিয়ে কারিগরি শিক্ষার নামে সেখানে কি ঘটত, তা কারো নিকট অজানা ছিল না। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা কি করবে কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সকলেই এ ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়ে যে, সরকার যা বলে তা করেই ছাড়ে।

ঘটনার ৪/৫ দিন পরের কথা। মাওলানা জিয়াউল হাকীমসহ আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ফজরের জামাতে শরিক হয়েছেন। নামাজ শেষে তারা বাইরে এলেন। দেখলেন, বেশ কিছু সরকারী সেনা মুসল্লীদের মাঝে মেয়েদের নামের লিষ্ট বিতরণ করছে। চেহারায় তাদের পৈশাচিক হাসি। প্রত্যেকের হাতেই অত্যাধুনিক অস্ত্র।

সেনারা কারো সাথে কোনো কথা বলেনি। যাবার বেলায় শুধু বলে যায়- "লিষ্ট অনুযায়ী আজকের মধ্যেই সকলের উপস্থিতি চাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মেয়েকে নিয়ে যাবে। ব্যতিক্রম হলে কপালে কি আছে তা বোধ হয় বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।"

মাওলানা জিয়াউল হাকীম সকলের সাথে পরামর্শ করলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমরা সবাই মেয়েদের ছাড়াই ক্যাম্পে হাজির হব। গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকতেও এ অবমাননাকর হুকুম পালন করব না।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাওলানা জিয়াউল হাকীম আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে হাজির হলেন। তাদের একা আসতে দেখে অফিসার ক্রোধে কাঁপতে থাকে। সে ধমক দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলে-

: তোমরা একা এলে কেন? মেয়েরা কোথায়?

: মেয়েরা যেখানে থাকার সেখানেই আছে। মাওলানার সহজ সরল উত্তর।

: কি বললে তুমি?

: আমি এমন কিছু বলিনি যা আপনার বুঝতে অসুবিধে হবে। আমাদের শরিয়ত মেয়েদের একা একা বাইরে থাকতে নিষেধ করেছে, তাই নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

মাওলানার কথা শুনে অফিসারের গোটা মুখমণ্ডল ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠে। দু'চোখে হিংস্র শার্দুলের অগ্নিক্ষুধা। মুসলমানদের রক্তে অবগাহন করতে সে যেন উন্মত্ত। দ্রুত নিঃশ্বাসের দরুন প্রশস্ত বক্ষ বারবার উঠানামা করে। অবশেষে দাঁতে দাঁত পিষে সে বলে-

'মেয়েদের না এনে তোমরা যে অপরাধ করেছ, তার কঠিন পরিণতি অবশ্যই তোমাদের ভোগ করতে হবে।'

: যে কোনো পরিণতির জন্য আমরা প্রস্তুত। মাওলানা জিয়াউল হাকীমের শঙ্কাহীন জবাব।

: ঠিক আছে। তোমাদের ধৈর্য-সহ্য কতটুকু আছে তা আমি দেখে নিব।

এরপর তাদেরকে 'সিমুর খালি' ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। সেখানকার অফিসারও মেয়েদের না দেখে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। সে বলে-

: আমরা তো তোমাদের একা আসতে বলিনি। হুকুমনামা কি ভাল করে পড়ে দেখার সুযোগ পাওনি?

: পেয়েছি বটে।

: পুরোপুরি মানলে না যে!

: যতটুকু মানা সম্ভব ততটুকু মেনেছি।

: মেয়েদের নিয়ে আসা কি তোমাদের সম্ভব ছিল না?

: না

: কেন?

: ইসলামী বিধান আমাদের নিষেধ করে।

: কোথায় তোমাদের এই আইন লেখা আছে? অফিসারের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

: পবিত্র কুরআনের ১৮ পারায়।

অফিসার অগ্নিদৃষ্টি মেলে তাকায় মাওলানার দিকে। গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠে বলে- খামুস, বেআদব কোথাকার!

: আপনি আমাকে যা-ই বলেন না কেন, ধর্মের আমোঘ বাণী বলতেই হবে আমাকে। আপনার রাগ-বিরাগের কোনো পরোয়াই আমি করি না।

: চুপ কর্ শয়তান!

কে শয়তান, কে ফেরেশ্তা তা আপনি নিজেও বুঝেন। সুতরাং....

আর কথা বাড়াতে দেয় না অফিসার। সে কথায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে কাপুরুষের মতো অধীনস্থ সেনাদের নির্মম নির্দেশ দিয়ে বলে-

'এই খবিশদের কাপড়-চোপড় খুলে একদম উলঙ্গ করে দাও। তারপর ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী নোংরা ও আবর্জনাময় স্থানগুলো পরিষ্কার করতে বাধ্য কর। আমার নির্দেশের চুল পরিমাণ এদিক সেদিক হলে কারো রক্ষা নেই।'

সেনারা পাষণ্ড অফিসারের নির্দেশ পালন করল। তারা শত শত বনী আদমের সামনে মুসলমানদের কাপড়-চোপড় টেনে ছিড়ে একদম উলঙ্গ করে ফেলল। তারপর পশুর মতো হাঁকিয়ে নিয়ে পূতিদুর্গন্ধময় স্থান পরিষ্কার করতে বাধ্য করল।

মুসলমানদের এ দলটির মধ্যে মাওলানা সিরাজুল হক নামের ১১৫ বছরের এক বৃদ্ধ ছিল। তিনি বসে বসে তাসবীহ পাঠ করছিলেন। কিন্তু মানবরূপী হিংস্র হায়েনাগুলোর তাও সহ্য হলো না। তারা এ অশীতিপর বৃদ্ধের তাসবীহ কেড়ে নিয়ে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করল। অতঃপর তাকেও কাজে লাগিয়ে দিলো।

বিবস্ত্র অবস্থায় বিরাম-বিশ্রামহীনভাবে উৎকট দুর্গন্ধের স্থানগুলো একের পর এক ছাফ করে যেতে লাগলেন অসহায় মুসলমানগণ। যাদের মধ্যে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত আলিমও ছিলেন। যোহরের সময় হলে তাঁরা নামাজ পড়ার সময় চাইলেন।

জবাবে এক অফিসার বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, নামাজ পড়তে হবে না। যে কাজে আছ, তা-ই মনযোগের সাথে করতে থাক। এতে নামাজের চেয়েও ঢের প্রতিদান মিলবে।

বেলা ২টা সময় মুসলমানদেরকে এক উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট পাঠানো হয়। সেখানে আলিমদের এক লাইনে এবং সাধারণ মুসলমানদের আরেক লাইনে বসানো হয়। সকলেই তখন মনে মনে নিজ নিজ পরিণতির কথা চিন্তা করছিল।

অফিসার প্রথমে আলিমদের কাছে যায়। সে তাদের ঐ একই প্রশ্ন করে যা পূর্বোক্ত দুই অফিসার করেছিল। জবাবে তাঁরা পূর্বের কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন। এতে অফিসার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে এবং বলে- তোমাদের শুধু শরিয়ত নয়, সরকারী আইনও মানতে হবে।

উত্তরে মাওলানা জিয়াউল হাকীম বলেন, সরকারী নির্দেশ মানতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তা যদি ইসলামী বিধি নিষেধের----

: পরিপন্থী হয়, তাহলে তোমরা মানতে পারবে না। এই তো? মাওলানার মুখ থেকে কথাটি কেড়ে নিয়ে বলল অফিসার।

: হ্যাঁ, তাই।

: অন্যান্য মুসলিম দেশের মেয়েরা তো পর্দা মেনে চলে না। তারা একা একা রাস্তায় বের হয়। তারা যদি পারে, তবে তোমাদের মেয়েরা তা পারবে না কেন?

: জনাব! আপনাদের ধর্মেতো চুরি করা, খুন করা, জেনা করা মহাপাপ। অথচ আপনাদের সমাজের অনেকেই তা মানছে না। তাই বলে কি তা বৈধ হয়ে গেল? ধর্মের কোনো বিধান কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠি কিংবা কোনো দেশের লোকজন না মানলেই কি উক্ত ধর্মের অপরাপর লোকদের জন্য তা জায়েজ হয়ে যায়?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে না পেরে অফিসার থ' মেরে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেওয়ার মতো কোনো কথাই সে খুঁজে পেল না। এতে মনে মনে চরম অপমান বোধ করল সে ।

সশস্ত্র সেনাদের বেষ্টনীতে এসে মুসলমানরা এভাবে নির্ভীকচিত্তে কথা বলবে-এ ছিল অফিসারের কল্পনারও বাইরে। রাগে ক্রোধে ফোঁস

ফোঁস করতে থাকে অফিসার। তাঁর নিঃশ্বাস তখন দ্রুত বইছে। চোখ দিয়ে যেন নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

কাছে দণ্ডায়মান দু'জন সেনাকে ইশারা করল অফিসার। দ্রুত এগিয়ে এল তারা। নিকটে আসতেই হৃদয়হীন অফিসার মাওলানা জিয়াউল হাকীমকে দেখিয়ে বলল, এ নর্দমার কীটটাকে গাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে আচ্ছামত বেত্রাঘাত কর।

সৈন্যরা সাথে সাথে নির্দেশ পালন করল। তারা মাওলানা জিয়াউল হাকীমকে টেনে হেঁচড়ে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেল। তারপর মজবুত করে গাছের সাথে বেঁধে শুরু করল নিষ্ঠুর নির্যাতন। মাওলানার বিবস্ত্র দেহে একের পর এক বেত্রাঘাত চলছে। প্রতিটি আঘাতের সাথে তার দেহের চামড়া ছিড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। কিন্তু মাওলানা নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অবিশ্বাস্য রকমের শান্ত। একটু উহ! আহ! শব্দও বের হচ্ছে না তার মুখ দিয়ে। শুধু মাঝে মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দের সুমধুর ধ্বনিতে তার ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠছে।

দয়ামায়াহীন সেনারা অফিসারের নির্দেশে সংজ্ঞা হারানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মাওলানা জিয়াউল হাকীমকে পেটাল। মনে হলো, কে কার চেয়ে বেশী জোরে পেটাতে পারে এ নিয়ে যেন তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা চলছে। প্রতিটি বেত্রাঘাতের সাথে পৈশাচিক উল্লাস আর অট্টহাসিতে তারা ফেটে পড়ছে। ভাবখানা এমন, যেন মানুষকে নয়, পশুকে পেটাচ্ছে।

এ নির্মম অত্যাচারে এক সময় মাওলানা বেহুঁশ হয়ে পড়লে সেনারা তাকে একটি রুমে নিয়ে ফেলে রাখে। চেতনা ফিরে আসার পর তিনি সেখানে এমন এক বীভৎস দৃশ্য অবলোকন করেন, যা জীবনে কোনোদিন কল্পনাও করেননি।

তিনি দেখলেন, তাঁর সামনে আরাকানের শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে-কেরামকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাদের কারো মুখেই দাড়ি নেই। দাড়িগুলো একটু পূর্বে জোরপূর্বক কেটে সকলের সামনে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। উপস্থিত আলিমদের মধ্যে তাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা নবী হোসেন, বার্মার মুফতীয়ে আজম মাওলানা সুলতান আহমদ

এবং বিশিষ্ট আলিম মাওলানা জাফর আলী সাহেবও ছিলেন। তারা মাওলানা জিয়াউল হাকীমকে দেখে লজ্জায় অপমানে সাথে সাথে মাথা নিচু করে ফেলেন। তাদেরও একটাই অপরাধ যে, সেনা অফিসারদের মর্জি মাফিক তারা নিজ নিজ মেয়েকে ক্যাম্পে হাজির হতে অস্বীকার করেছিলেন।

মাওলানা জিয়াউল হাকীম বলেন, আরাকানের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের দাড়িবিহীন মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যখন কঠিন মর্মপীড়ায় ভুগছিলাম, ঠিক তখন বলিষ্ঠ দেহের কয়েকজন সেনা ধারালো চাকু নিয়ে হাজির হলো। তাদের হাতে চাকু দেখে এ ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল যে, না জানি এ নরপশুরা বহুদিনের সযত্নে লালিত আমার দাড়িগুলোও কেটে দেয়। কিন্তু যা কোনোদিন ভাবতে পারিনি, যা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি, নির্দয় সেনারা তা-ই করে দেখাল। তারা আমার শত বাধা ও নিষেধ সত্ত্বেও জোরপূর্বক আমার দাড়িগুলো কেটে নিল। এতে আমি মনে মনে যে কষ্ট অনুভব করেছিলাম, জীবনে বোধ হয় কোনোদিন এত কষ্ট অনুভব করিনি। সুন্নতের এ অবমাননা দেখে আমার মাথায় আগুন ধরে যায়। যদি তখন আমার হাত-পা বাধা না থাকত তাহলে সেখানো উপস্থিত কোনো সেনা কিংবা অফিসারও আমার হাত থেকে রেহাই পেত না। কিন্তু হায়! আমি যে অসহায়।

আমার দাড়ি কাটা শেষ হওয়ার পর সৈন্যরা আমাকে টেনে নিয়ে অন্যান্য আলিমদের সাথে বসিয়ে রাখে। অনেক্ষণ পর ১০টি গ্রামের উপস্থিত ১০০টি মেয়ের পিতাকে আমাদের অবস্থা দেখিয়ে সাবধান করে দেওয়া হয় যে, কেউ সরকারী আইন মানতে অস্বীকার করলে তার অবস্থা এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে।

মাওলানা জিয়াউল হাকীম আরও বলেন, পরদিন ১০টার মধ্যে মেয়েদের নিয়ে ক্যাম্পে হাজির হওয়ার কড়া নির্দেশ দিয়ে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি বাড়ি ফিরে অনেক চিন্তা-ভাবনা করলাম। পরে যখন দেখলাম, নিষ্ঠুর জালিমদের অত্যাচারে এখানে স্ত্রী-পুত্র ও মেয়েদের নিয়ে ঈমান আমলের সাথে বসবাস করা সম্ভব নয়, তখন পরামর্শ করে ঐ রাতেই পরিবার-পরিজনসহ বাংলাদেশে হিজরত করি।

www.smfoundationbd.com

প্রিয় পাঠক! এ ঘটনা আরাকানের হাজারো লোমহর্ষক নির্যাতনের একটি সামান্য চিত্র মাত্র। প্রতিদিন এ ধরনের অসংখ্য অমানবিক ঘটনা এখানে ঘটে চলছে। মুসলিম অধ্যুষিত আরাকান বর্তমানে এমন এক ভূমি, যার প্রতিদিন শুরু হয় মানবতা লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে, আর শেষ হয় মজলুম মানুষের আকাশ বাতাস ভারী করা আহাজারী দিয়ে। রাতের আঁধার কেটে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মুসলমান আতঙ্কে থাকে- এই বুঝি আমার সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হলো, এই বুঝি আমার মা-বোনের ইজ্জত মানুষরূপী হায়েনাদের হিংস্র থাবায় নিঃশেষিত হলো। কিন্তু এত কিছুর পরও কোটি কোটি মুসলমানদের নিদ্ ভাঙ্গছে না। আজকে ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্থানসহ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে মুসলমানদের উপর বর্বর নির্যাতন চলছে। তাদের রক্তের যেন পানির মতো মূল্যও নেই। যে যেভাবে পারছে মুসলমানদের হত্যা করছে। নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাচ্ছে। আর আমরা দূর থেকে কেবল তামাশা দেখছি। কখনো বা দু'একটা বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েই আপন দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করছি। অথচ রাসূলে আকরাম (সা:) বলেছেন-সমস্ত মুসলমান একটি দেহের মতো। দেহের একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে সমস্ত অঙ্গ যেমন ব্যথিত হয়, ঠিক অনুরূপভাবে যে কোনো মুসলমান বিপদগ্রস্ত হলে তার জন্য ব্যথিত হতে হবে এবং তার বিপদ মুক্তির জন্য নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে সকলকেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আরও দুঃখের কথা এই যে, মুসলমানরাই মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী, জঙ্গী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে যারা বিপদগ্রস্থ মুসলমানদের বিপদ মুক্তি ও কল্যাণের জন্য নিজেদের আরামকে হারাম করে দিবানিশি পরিশ্রম করে যাচ্ছে। প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে নিয়ে জালেমদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

হে আল্লাহ! তুমি মুসলমানদের সুমতি দাও। সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত কুফরি শক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার তৌফিক দাও। সিংহের জাতি মুসলমানকে পুনরায় তুমি আত্মমর্যাদাবোধ ফিরিয়ে দাও। আমীন। ছুম্মা আমীন। *

* সূত্র : মাসিক জাগো মুজাহিদ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যা। বি. দ্র. এ লেখাটি স্নেহের ছোট বোন আলেমা হুমাইরা আক্তার উল্লিখিত পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে।

www.smfoundationbd.com

যদি পেতাম এমন শাসক

সেই স্বর্ণযুগের কথা।

হযরত সাঈদ ইবনে আমের তখন হিমসের গভর্নর। লৌহমানব হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তাঁকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেছেন।

কিছুকাল পরের ঘটনা।

একদা একটি প্রতিনিধি দল খলিফার দরবারে উপস্থিত। হিম্সনগরী থেকে তারা আগমন করেছেন। নগরীর বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা শুরু হয়েছে। খলিফা প্রশ্ন করছেন, তারা উত্তর দিচ্ছেন। আবার কখনো প্রতিনিধি দল কোনো সমস্যার কথা তুলে ধরছেন, খলিফা তার সুষ্ঠু সমাধান বাতলে দিচ্ছেন। এভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো।

আলোচনা প্রায় শেষের দিকে। একটু পরেই প্রতিনিধি দল বিদায় নেবে। এমন সময় আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) প্রতিনিধি দলের লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন-

তোমরা হিম্স নগরীর দুঃস্থ, গরিব ও অসহায় লোকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিয়ে যাও। আমি বায়তুল মাল থেকে তাদের সাহায্য করব।

তারা তালিকা তৈরি করল। উপস্থিত করল হযরত উমর (রা.)-এর দরবারে। এ তালিকায় হিমসের গভর্নর হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রা.)-এর নামও ছিল।

উমর (রা.) তালিকাটি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ একস্থানে গিয়ে তাঁর চোখ আটকে গেল। তিনি দেখলেন, সেই তালিকায় হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রা.)-এর নামও আছে। তিনি বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? এখানে দেখছি সাঈদের নামও। কোন সাঈদ ইনি?

তারা বলল, আমাদের প্রিয় গভর্নর হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রা.)। অন্যান্য গরিব লোকদের নামের সাথে তাঁর নামও আমাদের লিখতে হলো।

: কেন? তোমাদের গভর্নর কি দরিদ্র? তিনি কি গরিব? সীমাহীন আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে হযরত উমর (রা.) প্রশ্ন করলেন।

: হ্যাঁ, তিনি গরিব। দরিদ্র। হিম্‌স নগরীতে তার মতো দরিদ্র খুব কম লোকই আছে। মাঝে মাঝে একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত তার পরিবারে এমন অবস্থা বিরাজ করে যে, চুলায় হাড়ি চড়িয়ে পাকানোর মতো কিছুই থাকে না।

হযরত উমর (রা.) নির্বাক নয়নে প্রতিনিধি দলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না। একটি অব্যক্ত বেদনা তাঁর সমস্ত অন্তরটাকে নিষ্পেষিত করে চলল। তাঁর চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু জড় হয়ে গণ্ডদ্বয়ে গড়াতে লাগল।

খলিফার দরবারে তখন পিনপতন নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। সকলের দৃষ্টি খলিফার চেহারায় নিবদ্ধ।

নীরবতা ভাঙ্গলেন খলিফা নিজেই। তিনি কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে প্রতিনিধি দলের হাতে একটি থলে উঠিয়ে দিয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন- তোমরা এ থলেটি নিয়ে যাও। এতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আছে। এটি গভর্নরকে দিয়ে বলবে, কষ্ট না করে এগুলো দিয়ে যেন সে দিন গুজরান করে।

প্রতিনিধি দল হিম্‌স ফিরে এল। তারা খলিফার দেওয়া এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা গভর্নর সাঈদ ইবনে আমেরের নিকট হস্তান্তর করল।

স্বর্ণমুদ্রার থলে পেয়ে সাথে সাথে গভর্নরের মুখ থেকে উচ্চারিত হলো,"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। ভাবখানা এমন যেন তিনি বড় কোনো বিপদে পড়েছেন।

হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে হযরত সাঈদ (রা.) সীমাহীন পেরেশান। অস্থির। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন-

জনাব! আপনাকে আজ বেশ পেরেশান দেখাচ্ছে। মনে হয় বড় কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আপনি। বারবার আপনি ইন্না লিল্লাহ পড়ছেন। তবে কি আমীরুল মুমিনীন ইন্তেকাল করেছেন?

হযরত সাঈদ (রা.) বললেন, না, আমীরুল মুমিনীন ইন্তেকাল করেননি। তবে আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা এর চেয়েও অনেক বড়।

: আপনার বিপদের কথাটি অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট খুলে বলবেন কি?

: হ্যাঁ, বলব। অবশ্যই বলব। তোমার নিকট বলার জন্যই এখানে এসেছি।

: তাহলে দেরি না করে বলে ফেলুন। আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না।

: শোন! কিছুক্ষণ পূর্বে খলিফার পক্ষ থেকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে আমার হস্তগত হয়েছে। খলিফার মহান ব্যক্তিত্বের কথা চিন্তা করে তা ফেরত পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রিয়ে! তুমি তো জান, আমি দুনিয়ার ধন-দৌলত মোটেও পছন্দ করি না। সুতরাং এ স্বর্ণমুদ্রাই হচ্ছে আমার পেরেশানীর মূল কারণ।

স্বামীর নির্লোভ অন্তরের খবর স্ত্রী আগেই পেয়েছিলেন। তবে তিনি এতটাই যে দুনিয়া বিমুখ, তা আগে তার জানা ছিল না। এখন স্বামীর মুখ থেকে কথাগুলো শুনে তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আরো শতগুণে বৃদ্ধি পেল।

স্ত্রী বললেন, প্রিয়তম! পেরেশান হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো গরিব মুসলমানদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেই চলবে।

: তুমি কি এতে রাজি আছ?

: অবশ্যই।

: এ কথা ভেবে তো কষ্ট পাবে না যে, এত অভাবের সংসারে কিছুটা সাহায্য পেয়েছিলাম। স্বামীর জন্য তা রাখতে পারলাম না।

: আমার ব্যাপারে কখনোই আপনি এমন ধারণা করবেন না। আমি অত্যন্ত খুশি মনে আপনার মনোভাবকে স্বাগত জানাচ্ছি।

স্ত্রীর কথায় হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রা.) যার পর নাই খুশি হলেন এবং তিনি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। মনে মনে বললেন, হে দয়াময় খোদা! তুমি আমাকে এমন এক স্ত্রী দান করেছ, যে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কেবল মূল্যায়নই করে না, যথেষ্ঠ শ্রদ্ধাও করে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার সবগুলোই গরিব মুসলমানদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন।

এ ঘটনার বেশ কিছু দিন পরের কথা। হযরত উমর (রা.) হিম্‌সবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সেখানে আগমন করেন। হিম্‌সবাসীরা খলীফাকে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত। তারা খলীফাকে দেখার জন্য ভিড় জমাল। চতুর্দিক থেকে মানুষের ঢল নামল। খলীফা স্বয়ং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানতে লাগলেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ চলার পর এক পর্যায়ে তিনি হিম্‌সবাসীকে সম্বোধন করে বললেন, আচ্ছা! তোমাদের গভর্নর সাঈদ ইবনে আমেরকে তোমরা কেমন পেলে?

তারা বলল, তিনি খুবই ভাল মানুষ। তার মতো ভাল মানুষ খুব কমই আছে। তবে তাঁর ব্যাপারে আমাদের তিনটি অভিযোগ আছে।

হযরত উমর (রা.) গভর্নর সাঈদ (রা.) ও হিম্‌সবাসীকে একত্রিত করে বললেন, এবার বল, গভর্নরের বিরুদ্ধে তোমাদের কি কি অভিযোগ আছে?

তারা বলল, গভর্নরের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ হচ্ছে- "তিনি প্রতিদিন কিছুটা বিলম্ব করে অফিসে আসেন।"

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) গভর্নর সাঈদের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে বুঝা যাচ্ছিল, তিনি যেন বলতে চাইছেন - সাঈদ! তোমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন কর।

হযরত সাঈদ (রা.) উঠে দাড়াঁলেন। তিনি বললেন-

'আমীরুল মুমিনীন! খোদার কসম, আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিতে সত্যি আমি লজ্জাবোধ করছি। কিন্তু আপনার এবং হিম্‌সবাসীদের অবগতির জন্য আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আমার বাসায় কোনো কাজের লোক নেই। কাজের লোক রাখার সামর্থও আমার নেই। তাই আমাকে গৃহস্থলি বিভিন্ন কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করতে হয়। এমনকি আটা ছেনে রুটি তৈরির কাজেও আমাকে সাহায্য করতে হয়। এতে আমার অফিসে যেতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়।

উমর (রা.) এবার হিম্‌সবাসীকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ পেশ কর।

তারা বলল, আমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, গভর্নর রাতের বেলা কারো ডাকে সাড়া দেন না।

এ অভিযোগের জবাবে হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রা.) বললেন, রাতের বেলা কেন আমি কারো ডাকে সাড়া দেই না, এর কারণও বলতে আমি অপছন্দ করি। এ জন্য হিম্‌সনগরীর কেউই তা জানে না। তবে আজ যেহেতু না বলে কোনো উপায় নেই, তাই বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হচ্ছে।

খলীফাতুল মুসলেমীন! আমি দিবা-রাত্রকে দু'ভাগে ভাগ করেছি। তন্মধ্যে প্রথম ভাগ অর্থাৎ দিবসের পূর্ণ অংশটি আমি মানুষের জন্য ধার্য করেছি আর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ রাত্রটিকে আমি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার জন্য খাস করে রেখেছি। এ জন্য রাতের বেলা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কারো ডাকে সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না।

এবার উমর (রা.) হিম্সবাসীদের বললেন, তোমাদের আর কি অভিযোগ আছে বল।

তারা বলল, আমাদের তৃতীয় এবং সর্বশেষ অভিযোগ হচ্ছে, গভর্নর মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে কারো সাথে সাক্ষাৎ করেন না।

উমর (রা.) বললেন, সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

সাঈদ (রা.) বললেন, এ ব্যাপারটি প্রকাশ করাও আমার ইচ্ছার বাইরে। তার পরেও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেয়ার মতো আমার কোনো খাদেম নেই। আমার পরনে যে জামাটি এখন দেখছেন, এটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো জামা-কাপড়ও আমার নেই। তাই মাসে একদিন কাপড়টি ধুয়ে শুকানোর অপেক্ষা করি। কাপড় শুকিয়ে গেলে দিনের শেষ ভাগে আমি মানুষের সামনে বের হই। তাই ঐদিন অফিস টাইমে অফিসে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না।

কথাগুলো শুনে হিম্সবাসীদের কেবল ভুলই ভাঙ্গল না, এমন নিষ্ঠাবান গভর্নরের প্রতি শ্রদ্ধায় তাদের মস্তক অবনত হয়ে এল। ভালবাসা ও মহব্বত বৃদ্ধি পেল পূর্বের চেয়ে বহুগুণে। আর আমীরুল মুমিনীন উমর (রা.) বলে উঠলেন-সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার, যিনি সাঈদের ব্যাপারে আমাদের নেক ধারণাকে ব্যর্থ করে দেননি।[১] আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হযরত সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

স্মরণীয় বাণী

খোদা ভীতির সাথে প্রাপ্ত অতি সামান্য বস্তু অন্যের মনে কষ্ট দিয়ে লাভ করা রত্ন ভান্ডারের চাইতে উত্তম।

– হযরত সুলাইমান (আঃ)

[১] আল-আরাবিয়্যাতুল লিন্ নাশিঈন ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২

www.smfoundationbd.com

৪

এক ফোঁটা চোখের পানি

মানুষ কাঁদে। বিভিন্ন কারণে কাঁদে। সে বিপদ-মসিবতের সম্মুখীন হয়ে যেমন কাঁদে, তেমনি কাঁদে আনন্দের আতিশয্যেও। আবার কখনো কখনো পাপ করার পর অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনার অশ্রুও সে ঝরায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ছোট্ট বালকের মতো।

আল্লাহ পাক কান্নাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। পছন্দ করেন। বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়; অনুশোচনার আগুন তার ভিতরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়; ঝরঝর করে ঝরতে থাকে অনুতপ্ত হৃদয়ের তপ্ত অশ্রু, তখন আল্লাহ পাকের রহমতের সাগরে জোশ্ উঠে। ফলে এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কেবল ক্ষমার ঘোষণাই দেন না, বরং তাকে পূর্বের চেয়ে অধিক মর্যাদাকর স্তরে উন্নীত করেন। অন্তর্ভুক্ত করে নেন নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে।

এক হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের আগুন হারাম। প্রথমতঃ যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। দ্বিতীয়তঃ যে চক্ষু ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের জন্য জাগ্রত রয়েছে।

অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম এবং যে চক্ষু নাজায়েজ দেখা থেকে বিরত রয়েছে তার উপরও

জাহান্নামের আগুন হারাম এবং যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার উপরও জাহান্নামের আগুন হারাম।

অন্য এক দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার তিনটি কাজ অতীব প্রিয়- (ক) জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে শক্তি ব্যয় করা (খ) পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা (গ) অন্ন কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করা।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, চোখের ঐ পানি যা আল্লাহর ভয়ে নির্গত হয় তার মূল্য অনেক বেশি। এর দ্বারা বান্দা অতি অল্প সময়ে মাওলা পাকের নিকটবর্তী হতে পারে। পরিগণিত হতে পারে তার প্রিয় বান্দা হিসেবে। আর এ জন্যই মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের নিকট অনুতাপের অশ্রু অত্যন্ত অপছন্দনীয়। সে কিছুতেই গুনাহগারদের চোখের পানিকে বরদাশ্‌ত করতে পারে না। কারণ সে জানে যে, বান্দা হাজার হাজার গুনাহ করে যে পরিমাণ আল্লাহ থেকে দূরে সরবে, অল্প সময় অনুতাপ ও অনুশোচনার অশ্রু ফেলে সে অনেক বেশী আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যাবে। নিম্নে এ ধরনের একটি ঘটনাই পাঠক সমীপে উল্লেখ করছি।

ছোট্ট একটি গৃহ। এরই এক কোণে বিশ্রাম নিচ্ছেন রাসূলের প্রিয় সাহাবী হযরত মুআবিয়া (রা.)। একটানা দীর্ঘক্ষণ মানুষের অভাব অভিযোগ শ্রবণের ফলে তিনি এখন ভীষণ ক্লান্ত। তাই বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন তিনি।

হঠাৎ কারো ডাকে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি উঠে বসলেন। এদিক ওদিক তাকালেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। ভাবলেন, কে আমাকে ঘুম থেকে উঠাল? দরজা-জানালা বন্ধ। কোনো মানুষেরতো ভিতরে আসার উপায় নেই। তাহলে ঘটনা কি?

মুআবিয়া (রা.) বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তন্ন তন্ন করে গোটা কামরা তালাশ করলেন। হঠাৎ দেখলেন, একটি লোক দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখখানা কালো কাপড়ে ঢাকা।

: কে তুমি? মুআবিয়া (রা.) কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

: আমি আপনার এক অতি পরিচিত ব্যক্তি।

: কি নাম তোমার?

: আমার নাম সবাই জানে। আমি ইবলীস।

: অভিশপ্ত ইবলীস! তুই এখানে কেন? কি মতলব নিয়ে এখানে এসেছিস্?

: হযরত! রাগ করবেন না। অন্য সময় আমি মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার নিকট আসলেও এখন কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি।

: বল, তোমার মহৎ (!) উদ্দেশ্যটা কি?

: জনাব ! নামাজের সময় শেষ হয়ে আসছে, তাই আপনাকে জাগিয়ে দিয়েছি। যেন মসজিদে গিয়ে যথাসময়ে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হন। আপনার নিশ্চয় জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

সময় শেষ হওয়ার আগেই জলদি ইবাদত আদায় কর।

: আমি এতো বোকা নই যে তোর একথা বিশ্বাস করব! তোর কথা তো ঐ চোরের ন্যায় হলো, যে ঘরে চুরি করতে এসে বলে যে, আমি পাহারা দিতে এসেছি। সুতরাং তোর কথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। যদি নিজের মঙ্গল চাস্ তবে সত্য কথা খুলে বল্।

: মুহতারাম! আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমিও তো এক সময় আল্লাহর রহমতের সমুদ্র থেকে পানি পান করেছি। তাঁর সন্তুষ্টির বাগান থেকে পরিতৃপ্ত হয়েছি। আজ কোনো এক কারণে তাঁর অভিসম্পাতের পাত্রে পরিণত হয়েছি। তথাপি তাঁর অনুগ্রহের দ্বার তো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। তাই এ অভিশপ্ত জীবনেও মাঝে মাঝে ভাল কাজ করে তাঁকে স্মরণের স্বাদ অনুভব করি। অন্তরের মণিকোঠায় শান্তি খুঁজি।

: কথাটি সত্য। তবে তোর বেলায় নয়। কারণ, আজ পর্যন্ত তুই লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছিস। মানুষের মঙ্গল তোর উদ্দেশ্য নয়। মনে রাখবি, কোনো প্রকার চালাকি কিংবা বাকপটুতা দেখিয়ে তোর শেষ রক্ষা হবে না। হে অভিশপ্ত! বল্, তুই কেন এবং কি উদ্দেশ্যে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছিস্?

: হযরত! আমার প্রতি আপনাদের স্বভাবগত বৈরীতা আছে। আপনারা আমাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না, তাই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। আসলে আমার কাজ হলো, সৎলোকদের সৎকাজের দিকে এবং অসৎলোকদের পাপ কাজের দিকে দিকে উদ্বুদ্ধ করা।

এবার মুআবিয়া (রা.) অত্যধিক রাগান্বিত হলেন। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে বজ্রকণ্ঠে বললেন, শয়তান কোথাকার! আবারো বলছি কথার মারপ্যাচ খাটানোর চেষ্টা করবি না। আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বল্। নইলে..

মুআবিয়া (রা.)-এর কথা শেষ হলো না। এরই মধ্যে ইবলীস বলে উঠল-

কারো প্রতি খারাপ ধারণা জন্মালে তার সত্য কথাটি শত দলিল প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপন করলেও মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না। কারণ একবার মনে সংশয়ের সৃষ্টি হলে দলিল প্রমাণ দ্বারা সেই সংশয় আরো বৃদ্ধি পায়। আমার অপরাধ শুধু এখানেই যে, আমি একটি ভুল করে বসেছিলাম। এতে গোটা দুনিয়ায় আমার দুর্নাম রটে গেছে। এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে পাপ করে, আর সে পাপের অভিসম্পাত আমার উপর এসে পড়ে। এছাড়া সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার এমন কি কষ্ঠিপাথর আপনার নিকট আছে যে, আপনি আমাকে বারবার মিথ্যুক সাব্যস্ত করছেন? ইবলীস কিছুটা উত্তেজিত হয়েই কথাগুলো বলল।

মুআবিয়া (রা.) বললেন-

হ্যাঁ, আমার নিকট সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার কষ্টিপাথর অবশ্যই আছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "মিথ্যা অন্তরে সংশয়ের জন্ম দেয় আর সত্য মনে স্বস্তি আনয়ন করে।"

অর্থাৎ মিথ্যা মানুষের অন্তরকে অস্থির করে তুলে। শান্ত মনকে অশান্ত করে। দিল কিছুতেই তখন স্থির হয় না। পক্ষান্তরে সত্য কথায় অন্তরে স্বস্তি আসে, দিল শান্ত হয় এবং নিজে তা গ্রহণ করতে উদ্বেলিত হয়। হে বিতাড়িত শয়তান! আমি মহান আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহে আমার চরিত্রকে কুপ্রবৃত্তির চাহিদা, লোভ ও হিংসা থেকে পবিত্র করে

নিয়েছি। আমার দিল এ পরিমাণ পবিত্র ও আলোকিত হয়ে গেছে যে, আমি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে সক্ষম।

হে অভিশপ্ত! জবাব দে এবং সত্য করে বল্ কেন তুই আমাকে ঘুম থেকে ডেকে জাগিয়ে তুলেছিস্। কেননা, তুই মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তুই চাস্ প্রতিটি মানুষ যেন এমন গভীর ঘুমে আছন্ন থাকে, যাতে তার নামাজ কাযা হয়ে যায়। এ পর্যায়ে এসে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.) শয়তানকে শক্ত করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেললেন এবং বললেন, এবার সত্য কথা না বলা পর্যন্ত তোকে ছাড়ছি না।

শয়তান এবার বিপাকে পড়ে গেল। সে বাধ্য হলো সত্য কথা বলতে। কেননা, এতক্ষণে তার সকল প্রকার ধোঁকাবাজী ও ছল-চাতুরীর মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। সে বলল-

দেখুন জনাব! আমি আপনাকে এ জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত করেছি যেন আপনি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে আশ্বস্ত হন এবং এই ভেবে মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করেন যে, আমি ফরজ নামাজ আদায় করতে পারলাম। নতুবা আপনার অভ্যাস আমার ভাল করেই জানা আছে যে, যদি ঘুম কিংবা অন্য কোনো কারণে আপনার এক ওয়াক্ত নামাজও ছুটে যায়, তাহলে সমগ্র দুনিয়া আপনার সামনে অন্ধকার হয়ে আসে। সীমাহীন পেরেশান ও অস্থির হয়ে পড়েন আপনি। এমনকি এর জন্য আপনি অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে এত বেশি কান্নাকাটি ও অশ্রু বিসর্জন দেন যা আপনাকে সময় মত নামাজ পড়ার চেয়েও অধিক সম্মানজনক স্থানে উন্নীত করে দেয়। আর আপনি এত সওয়াব ও মর্যাদার অধিকারী হওয়াটা আমার একেবারে সহ্যের বাইরে। কিছুতেই আমি এটাকে বরদাশ্ত করতে পারি না। তাই আমি আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছি। নইলে নামাজ আমার সহ্যের বস্তু ছিল কোন কালে যে, তার জন্য আমি আপনাকে জাগিয়ে তুলব!

ইবলীসের এ বক্তব্য শুনে হযরত মুআবিয়া (রা.) বললেন, হ্যাঁ, এবার তুই সত্য কথা বলেছিস্। বাহ্যত তুই আমাকে ভালোর দিকে আহবান করলেও তোর উদ্দেশ্য ভাল নয়। তোর মতলব খুবই খারাপ। তুই চাস আমি অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দরবারে যেন হাজির হতে না

www.smfoundationbd.com

পারি এবং চক্ষুদ্বয় থেকে অনুশোচনার অশ্রু ঝরাতে না পারি। কারণ, মু'মিন ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে যে অশ্রু বিসর্জন দেয়, তা আল্লাহর দরবারে তাকে অধিক সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে। আর তোর জন্য তা দেখা দেয় অত্যধিক মর্মজ্বালা হয়ে।

প্রিয় মুসলিম ভাইগণ! আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে, আল্লাহর ভয়ে কিংবা তাঁর স্মরণে কান্নাকাটি করা অনেক বড় নিয়ামত। বড় ভাগ্যবান ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামত দান করেছেন। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে, সে ঐ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত দুধ স্তনের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ না করে।

অর্থাৎ দুধ স্তনের মধ্যে প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও সেরূপ অসম্ভব। আরেক হাদীসে আছে-

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে, এমনকি তার চোখের এক ফোঁটা পানিও মাটিতে পড়েছে, কিয়ামতের দিন তাকে কোনো আজাব দেওয়া হবে না।

সুতরাং আমার সকল পাঠক-পাঠিকা ও মা-বোনদের বলছি- আসুন, আজ থেকেই আমরা দিবা-রাত্রির একটি নির্জন প্রহর বেছে নেই এবং ঐ সময় আল্লাহ তা'আলাকে গভীরভাবে স্মরণ করি। অতীতের গুনাহের কথা মনে করে ঝরঝর করে কাঁদতে থাকি। অনুতপ্ত হৃদয় থেকে অনুশোচনার অশ্রু বিসর্জন দেই। আমার বিশ্বাস, আমাদের এ অশ্রু কখনোই বৃথা যাবে না, যেতে পারে না। হাদীস শরীফে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া হবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে আপন রহমতের ছায়ার নিচে আশ্রয় দান করবেন। তন্মধ্যে একজন হলো ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে বসে আল্লাহর জিকির করে এবং তার চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে চক্ষু থেকে আল্লাহর ভয়ে সামান্য মাছির মাথা পরিমাণ পানিও বের হয়েছে

[১] বুখারী, মুসলিম

www.smfoundationbd.com

আল্লাহ পাক ঐ চেহারাকে দোজখের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন- মানুষের অন্তর যখন আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে তখন গাছের পাতার মতো তাঁর পাপসমূহ ঝরে যায়।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে জিজ্ঞেস করেন- হে আল্লাহ রাসূল! নাজাতের উপায় কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আপন জিহ্বাকে সাবধানে চালনা কর। ঘরে বসে থাক এবং আপন অপকর্মের জন্য কাঁদতে থাক।

একদা আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মত থেকে কেউ কি বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, যে আপন গুনাহকে স্মরণ করে কাঁদতে থাকে (সে বিনা হিসেবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে)। অন্য এক হাদীসে আছে, দু'টি ফোঁটা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়। একটি অশ্রুর ফোঁটা, অন্যটি আল্লাহর রাস্তায় পড়া রক্তের ফোঁটা।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযীঃ) বলেন, যার কান্না আসে সে তো কাঁদবেই আর যার কান্না আসে না সে কমপক্ষে কান্নার ভান করবে।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের (রা.) চোখের পানি মুখে এবং দাঁড়িতে মুছে দিতেন এবং বলতেন- বর্ণিত আছে, জাহান্নামের আগুন ঐ স্থান স্পর্শ করে না যেখানে কান্নার পানি পৌঁছায়।

হযরত ছাবেত বানানী (রহঃ)-এর চোখে বেদনা অনুভূত হলে তিনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার বললেন-আপনি কান্না বন্ধ করলেই চোখ ভাল হয়ে যাবে। জবাবে তিনি বলেন- কান্না বন্ধ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। কেননা, ঐ চক্ষুর কি মূল্য আছে যে চক্ষু কাঁদে না।

এযীদ ইবনে মাইসারা (র.) বলেন, মানুষ সাত কারণে কেঁদে থাকে। যথা- ১) আনন্দের দরুন ২) পাগলামির দরুন ৩) ব্যথার কারণে ৪) ভয় পেলে ৫) দেখানোর জন্য ৬) নেশা অবস্থায় ৭) আল্লাহর ভয়ে। শেষোক্ত কান্নাই এমন কান্না যার একটি মাত্র ফোঁটা অগ্নির সমুদ্রকে নিভিয়ে দিতে সক্ষম।

www.smfoundationbd.com

কা'আব আহবার (রা.) বলেন, যার হাতে আমার জান সেই আল্লাহর কসম করে বলছি- আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে চেহারা ভিজিয়ে ফেলা আমার নিকট পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।*

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে উল্লিখিত ঘটনা ও হাদীসসমূহ থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসানোর অভ্যাস গড়ে তোলার তৌফিক নসীব করুন। আমীন। আর পাঠক-পাঠিকাদের সমীপে আরজ হলো, এ বিশেষ মুহূর্তে আপনারা অধম লেখক ও তার পরিবার পরিজনকে যেন ভুলে না যান। হতে পারে আপনাদের এ নেক দোয়া ও সুদৃষ্টি তাদেরকে সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিবে এবং কিয়ামতের কঠিন দিনে নাজাতের অসিলা হবে। হে দয়াময় প্রভু! তুমি আমাদের সকলের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর। তোমার হুকুমগুলো একশভাগ মানার তৌফিক দাও। আমীন। ছুম্মা আমীন॥

টুকরো কথা

শরীয়তের একটি বিন্দু মুছে যাওয়া আসমান জমীন স্থানচ্যুত হওয়ার চাইতেও গুরুতর।

– হযরত ঈসা (আঃ)

* ফাযায়েলে আমাল।

www.smfoundationbd.com

৫

এরই নাম খাঁটি তওবা

হিজরতের পর আনসার আর মুহাজিরদের মাঝে গড়ে উঠেছে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। মদীনার আনসারগণ মুহাজির ভাইদের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর অপূর্ব নজির পেশ করছেন। তাদের আরাম ও শান্তির জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ সকল ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি একাধিক স্ত্রী থাকলে মুহাজির ভাইয়ের পছন্দমত কোনো একজনকে তালাক দিয়ে তাকে তার হাতে তুলে দেয়ার আগ্রহও পেশ করছেন। মোট কথা মক্কা থেকে আগমনকারী মুহাজির ভাইদের কোনো প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি রেখে চলছেন মদীনার আনসারগণ।

আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন স্বয়ং রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি একেকজন মুহাজিরকে একেকজন আনসারীর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে আনসারগণ এতটাই আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন যে, পূর্বে কারো দুই ভাই থাকলে এখন তিনি মনে করতেন, আমার ভাই তিনজন। এক কথায় আনসারগণ মুহাজিরদেরকে আপন ভাইয়ের মতোই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান দিতেন।

সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান ছিলেন মুহাজির সাহাবী। হিজরতের পর তিনি ও সালাবাতুল আনসারী (রা.)-এর মাঝে সৃষ্টি হয় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবূক অভিযানে গেলেন, তখন তাঁর সাথে গমন করেছিলেন হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান (রা.)। আর সালাবাতুল আনসারী (রা.) পেয়েছিলেন সাঈদ (রা.)-এর বাড়িঘর দেখাশুনার দায়িত্ব।

www.smfoundationbd.com

সালাবা (রা.) প্রত্যহ সাঈদ (রা.) এর বাড়িতে আসতেন। খোঁজ-খবর নিতেন। কোনো কাজ থাকলে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করতেন।

একদিনের ঘটনা।

সালাবা (রা.) সাঈদ (রা.) এর বাড়ী আসলেন। খোঁজ খবর নিলেন। এ সময় বাড়ীতে সাঈদ (রা.) -এর সুন্দরী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। এ সুযোগে সালাবা (রা.) কে অভিশপ্ত শয়তান ফুসলাতে লাগল। বারবার ধোঁকা দিল। হযরত সালাবা (রা.) শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গেলেন। তিনি অগ্র-পশ্চাত না ভেবে পর্দা সরিয়ে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সাঈদ (রা.)-এর স্ত্রীর হাত স্পর্শ করলেন।

এ অপ্রত্যাশিত অস্বাভাবিক আচরণে সাঈদ (রা.)-এর স্ত্রীর বুক থর থর করে কেঁপে উঠে। শিউরে উঠে তার শরীর। বিবর্ণ হয়ে উঠে মুখমণ্ডল। চোখ দু'টোতে ফুটে উঠে ভয়ার্ত ভাব। তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন-

"হে আল্লাহর বান্দা! আপনার যে ভাই খোদার রাহে জিহাদে গিয়েছেন, আপনি কি তার আমানতে খেয়ানত করতে উদ্যত হয়েছেন?"

এতটুকু কথা সালাবা (রা.)-এর অন্তরে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু করল। একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন দোলা দিয়ে গেল তার হৃদয় মনে। কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

ভুল বুঝতে পেরে তিনি এক মুহূর্ত কাল বিলম্ব করলেন না। সাথে সাথে ক্ষমা, ক্ষমা বলে চিৎকার করে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। বারবার প্রচণ্ড আওয়াজে বলতে লাগলেন-

"ইলাহী! আমি পাপী। আমি গুনাহগার। কিন্তু তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।"

ঘটনার কয়েকদিন পর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক অভিযান শেষে সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় তাশরীফ আনলেন। তখন মদীনায় যারা ছিলেন তাদের সকলেই গাজী ভাইদের সংবর্ধনার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু সালাবা (রা.)-কে কোথাও দেখা গেল না। তিনি

www.smfoundationbd.com

ক্ষমা প্রাপ্তির আশায় পাগলের ন্যায় এদিক সেদিক উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে লাগলেন।

সাঈদ (রা.) বাড়ি এসে সব কিছু শুনলেন। সালাবা (রা.)-এর উপর চরম অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু যখন তিনি ক্ষমা প্রাপ্তির ব্যাপারে তার নজিরবিহীন অস্থিরতার কথা শুনলেন তখন তার রাগ পড়ে গেল। তিনি ভাবলেন, শয়তানের ধোঁকায় পড়েই সালাবা এমনটি করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সুতরাং এখন তার অনুসন্ধান করা দরকার।

সাঈদ (রা.) সালাবা (রা.)-কে এখানে সেখানে সর্বত্র খুঁজে ফিরলেন। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে পেয়ে বললেন- ভাই সালাবা! তুমি আমার সঙ্গে চল। আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

সালাবা (রা.) বললেন, না, আমি এভাবে যাব না। যদি তুমি আমার হাতকে ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে সেই রশি ধরে আমাকে একটি অপমানিত গোলামের ন্যায় টেনে নিয়ে যাও, তবেই আমি যাব, অন্যথায় নয়।

: এরূপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি আমার সাথে এমনি চল।

: না, এভাবে আমি যাব না। যেতে পারি না। কারণ আমি যে মারাত্মক পাপ করেছি তার পরিণতি আমি দুনিয়াতেই ভোগ করতে চাই, আখিরাতে নয়।

: মাফ করে দিলে তো সেই পাপের ফল ভোগ করার কোনো প্রয়োজন থাকে না।

: তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আমি তোমার আমানতে হাত দিয়ে যে জঘন্য অপরাধ করেছি, তার অপমানজনক শাস্তি ভোগ না করলে আমার অস্থির মন কখনোই শান্ত হবে না। অতএব আমাকে নিতে চাইলে আমি যেভাবে বলেছি, সেভাবেই তোমাকে নিতে হবে।

সালাবা (রা.)-এর দৃঢ়তায় সাঈদ (রা.) বিপদে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত অপারগ হয়ে তিনি তাই করলেন।

সালাবা (রা.) হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা অবস্থায় সর্বপ্রথম হযরত উমর (রা.) এর কাছে পৌঁছলেন। বললেন-আমি এরূপ পাপ করেছি। আমার এ অন্যায়ের জন্য তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

ঘটনা শুনে উমর (রা.)-এর সুন্দর মুখমণ্ডল রাগে রক্তাক্ত হয়ে উঠে। উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ দু'টোতে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অধর দংশন করেন তিনি। অবশেষে দাঁতে দাঁত পিষে বলেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমার নিকট তোমার কোনো তওবার ব্যবস্থা নেই।

এরপর তারা হাজির হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দরবারে। তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর তওবার পন্থা বাতলানোর অনুরোধ করলে তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সেখান থেকে নিরাশ হয়ে তারা হযরত আলী (রা.)-এর দরবারে পৌঁছলেন। কিন্তু তিনিও তাদেরকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, আমার নিকট তোমার জন্য তওবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

তারপর সালাবা (রা.) এক বুক আশা নিয়ে দয়ার সাগর রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি ভাই সাঈদকে সম্বোধন করে বললেন, ভাই সাঈদ! আশা করি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিরাশ করবেন না।

সেখানে যাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাবা (রা.)-এর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকালেন। বললেন, সালাবা! তুমি তো আমাকে দোজখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।

তখন সালাবা (রা.) বিনীত কণ্ঠে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমি আমার মুহাজির ভাইয়ের স্ত্রীর হস্ত স্পর্শ করেছি। এ জন্য আমি অনুতপ্ত। চরমভাবে লজ্জিত। আমি তওবা করতে চাই। আমার তওবার কোনো ব্যবস্থা আছে কি?

সালাবা (রা.)-এর গুরুতর অপরাধের কথা শুনে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন বিস্মিত হলেন। তাঁর চোখে মুখে

www.smfoundationbd.com

ফুটে উঠে ক্রুদ্ধভাব। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন-সালাবা! এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তোমার জন্য তওবা নেই।

সর্বশেষ আশ্রয়স্থল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার থেকে নিরাশ হয়ে সালাবা (রা.) আরও বেশি অস্থির হয়ে পড়লেন। মনের অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে মুখভাবে। এবার কি করবেন তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। চরম পর্যায়ের পেরেশান হয়ে কখনও মাথার চুল টানছেন, কখনো বা অধর দংশন করে চলছেন।

এ অবস্থায় চলে গেল বেশ সময়। অতঃপর এক পর্যায়ে তিনি কি যেন ভেবে পাহাড়ের দিকে দৌড়ে পালালেন। তারপর উচ্চঃস্বরে বলতে লাগলেন-

হে দয়াময় প্রভু! আমি ওমরের নিকট হাজির হয়েছি, তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আবূ বকর ও আলীর নিকট উপস্থিত হয়েছি, তারাও আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সর্বশেষ আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে বড় আশা নিয়ে হাজির হয়েছি, কিন্তু তিনিও আমাকে নিরাশ করেছেন।

কিন্তু হে দীন দুনিয়ার প্রভু! তুমি আমার মালিক, আর আমি তোমার গোলাম। তোমার সুমহান-সুউচ্চ দরবারে তোমার গোলাম হাজির হয়েছে। যদি তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তবে আমার খুশির সীমা থাকবে না। আর যদি তুমিও আমাকে নিরাশ কর, তবে আমার ন্যায় হতভাগা আর কেউ নেই।

এসব কথা বলে তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন এবং ছোট্ট শিশুটির মতো আকুলভাবে ডুকরে ডুকরে কেঁদে ফিরতেন।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে একজন ফেরেশ্‌তা হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পাক আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন, এই বিশ্ব জগত ও সমগ্র মানব জাতিকে কি তিনি সৃষ্টি করেছেন না আপনি?

রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। এরপর ফেরেশ্‌তা বললেন, আল্লাহ

পাক ঘোষণা করেছেন- আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করেছি, এ সংবাদ তাঁকে পৌঁছে দিন।

ক্ষমার ঘোষণায় অপরিসীম এক আনন্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মনে দোলা দিয়ে যায়। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠে একটা অনাবিল মধুর হাসি। তিনি বললেন, এমন কে আছ, যে সালাবাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে?

হযরত আবূ বকর ও উমর (রা.) সেখানেই ছিলেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তাঁকে নিয়ে আসি।

এমন সময় হযরত আলী ও হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর নবী! সালাবাকে আমরা নিয়ে আসি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে হযরত আলী ও হযরত সালমান ফারসী (রা.) দেরি করলেন না। তারা সালাবা (রা.)-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। তালাশ করলেন, মদীনার পথে-প্রান্তরে, অলিতে-গলিতে। কিন্তু না, তাঁকে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে মদীনার উপকণ্ঠে কৃষি কর্মে লিপ্ত লোকদেরকে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে কৃষকরা বলল, আপনারা কি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তির সন্ধান করছেন?

তাঁরা বললেন, হ্যাঁ।

তখন কৃষকদের একজন বলল, তিনি রাত্রি কালে এখানে আসেন। এ বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দু'চোখ থেকে দরদর করে ঝরে পড়ে অশ্রুধারা।

হযরত আলী ও সালমান ফারসী (রা.) তাই নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন রাত হলো, তখন সালাবা (রা.) সেই বৃক্ষের নিচে উপস্থিত হলেন। তারপর মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

রাতের নিকষ কালো গাঢ় অন্ধকারে এতক্ষণ তারা সালাবা (রা.)-কে দেখতে পাননি। যখন তিনি ভূপৃষ্ঠের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন, তখন তারা কান্নার আওয়াজে বুঝতে পারলেন যে,

নিশ্চয়ই সালাবা এসেছেন; আর কান্নার এ করুণ সুর তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকেই উৎসারিত হচ্ছে।

তারা দ্রুতপদে সেদিকে গেলেন, যেদিক থেকে মর্মস্পর্শী কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল।

নিকটে গিয়ে তারা ডাকলেন-সালাবা! মস্তক উত্তোলন কর। কান্না থামাও। চল। আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করেছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন- আল্লাহর পেয়ারা হাবীব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনারা কি অবস্থায় দেখে এসেছেন?

তাঁরা বললেন- আমরা তাঁকে এমন অবস্থায় দেখে এসেছি, যেমন আল্লাহ পাকের পছন্দ ও তোমার আন্তরিক কামনা।

তারপর তাঁকে নিয়ে তাঁরা মসজিদে নববীতে হাজির হলেন। তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হযরত বিলাল (রা.) ইকামত বলছেন। এখনই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামাজ শুরু করবেন। তাঁরা তিনজন সর্বশেষ কাতারে শরিক হলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন সূরা ফাতিহা শেষ করে সূরা তাকাসুর শুরু করলেন। হযরত সালাবা (রা.) সূরার প্রথম অংশটুকু শ্রবণ করতেই চিৎকার দিয়ে উঠলেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাত্তা-যুরতুমুল মাকাবির' পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি আরো একটি বিকট চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

নামাজ শেষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাবা (রা.)-এর নিকট এলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.)- কে বললেন, তার মুখে একটু পানির ছিটা দাও।

সালমান (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাবা আর এ জগতে নেই। সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে।

এমন সময় সালবা (রা.)- এর কন্যা খামসানা এসে পিতার মৃতদেহ দেখে কাঁদতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-

হে খামসানা! তুমি এতে খুশি নও যে, আমি তোমার পিতা হই এবং ফাতিমা হবে তোমার বোন?

সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবশ্যই রাজি আছি।

জানাজা শেষে সালাবা (রা.)-এর লাশ কবরস্থানে পৌঁছানো হলো। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার সাথে রইলেন। কবরস্থানে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্ণ কদম মোবারক মাটিতে রাখছিলেন না, বরং পায়ের উপর ভর করেই তিনি হাঁটছিলেন।

দাফন কার্য সমাপ্তির পর হযরত ওমর (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে এ অস্বাভাবিক চলার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ওমর! কবর স্থানে এত অধিক পরিমাণে ফেরেশ্‌তা জমা হয়েছিল যে, মাটিতে পা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখেছেন কি? একজন মানুষের মধ্যে কি পরিমাণ আল্লাহর ভয় থাকলে, সে একটি মাত্র গুনাহ করে এত বেশি পরিমাণে অস্থির হয়ে পড়তে পারে? বস্তুত হযরত সাহাবায়ে কেরাম আর আমাদের মাঝে মূল পার্থক্য এখানেই। তাঁরা অনিচ্ছায় কিংবা ভুলবশত কোনো পাপ করে ফেললেও তা মাফের জন্য যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতেন। যে কোনো কষ্ট হাসি মুখে বরণ করে নিতেন। আর আমরা অবলীলায় হাজারো গুনাহ করে যাচ্ছি। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অহরহ অমান্য করছি। কিন্তু কই? আমাদের মাঝে তো এমন পরিবর্তন আসে না! গুনাহ হয়েছে জানার পরও তা মাফের জন্য এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়ি না। যেমন ধরুন আপনি হয়ত আগে জানতেন না, দাড়ি সেভ করলে, অধীনস্থ মেয়েদেরকে বেপর্দায় রাখলে, গান শুনলে, টিভি দেখলে, কবীরা বা জঘন্য রকমের গুনাহ হয়। কিন্তু যখন জানলেন যে, এসব কাজ করলে কবীরা গোনাহ হবে, সম্মুখীন হতে হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির- তখন কি আপনি সাথে সাথে তাওবা করেন? আপনি কি তখন প্রতিজ্ঞা করেন যে, এসব কাজ আর কোন দিন করব না- দাড়ি কাট-ছাট করব না, বেপর্দায়

চলব না, নামাজ ছাড়ব না, অধীনস্থ মহিলাদেরকে পর্দাহীন ভাবে ঘুরতে দেব না, টিভি, স্যাটেলাইট চ্যানেল, ভিসিডি দেখব না? ইত্যাদি। যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করতেন এবং সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করার জন্য যথাসম্ভব সবকিছুই করতেন, তবে কি আল্লাহ তাআলা আপনার উপর অধিক খুশি হতেন না? এরূপ প্রতিজ্ঞা কি আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বয়ে আনত না? অবশ্যই। অবশ্যই।

মুহতারাম সুধী! আমরা নিষ্পাপ নই। নিষ্পাপ থাকা সম্ভবও নয়। কারণ, আমাদের দু'টো ভয়ানক শত্রু আছে। তন্মধ্যে একটি হলো মন-রিপু, আর আরেকটি হলো খোদাদ্রোহী শয়তান। উভয়ের বিষাক্ত দংশনে মানুষ অনেক সময় মোহগ্রস্ত ও নির্বোধ হয়ে পড়ে। জৈবিক উন্মাদনায় তার মনুষ্যত্ব লোপ পায়। নেমে আসে পশুত্বের কাতারে। অতঃপর সে কখনো হিংস্র হায়েনার রূপ ধারণ করে, কখনো বিষাক্ত সাপের রূপ পরিগ্রহণ করে। তখন তার নিষ্ঠুরতম হিংস্র থাবা কিংবা বিষাক্ত ছোবলে শুধু মানুষ নয়, গোটা সৃষ্টিজগত নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রকৃত মু'মিন ও আল্লাহর খাঁটি বান্দা তো তারাই যারা মোহ কেটে যাওয়ার সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়। অনুশোচনার জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হতে থাকে। বারবার হায় হুতাশ করে চোখের পানি ফেলে বলতে থাকে, হে করুণাময় খোদা! আমার ভুল হয়ে গেছে। এ জন্য আমি ভীষণ লজ্জিত। আমি তোমার নিকট তওবা করছি। অনুগ্রহ করে আমায় ক্ষমা করে দাও।

তখন তার অনুশোচনা ও চোখের পানি আল্লাহর ক্রোধকে ঠাণ্ডা করে দেয়। নিভিয়ে দেয় জাহান্নামের জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। এদিকে ইঙ্গিত করেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- গুনাহ থেকে সত্যিকার তওবাকারীর উদাহরণ ঠিক তেমন যেন তার কোনো গুনাহই নেই।

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীকে ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন।

www.smfoundationbd.com

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আদম সন্তান সবাই ভুলকারী-গুনাহগার। কিন্তু উত্তম তারা, যারা ভুল করার পর, পাপ করার পর তাওবা করে।

মোটকথা, মানুষ হিসেবে কখনো কখনো হয়তো আমাদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তখনই আমরা হযরত সাহাবায়ে কেরামের প্রকৃত অনুসারী বলে বিবেচিত হব; আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে পরিগণিত হব যখন ভুল বুঝার সাথে সাথে তওবা করে নিব।

তওবা-ইস্তিগফার দ্বারা যেমন গুনাহ মাফ হয়, তেমনি এর দ্বারা আল্লাহর দরবারে মর্তবাও বুলন্দ হয়। তাই কোনো গুনাহ না হলেও আল্লাহ পাকের শান অনুযায়ী ইবাদতের হক পূর্ণরূপে আদায়ে অক্ষমতার কথা ভেবে সকলের সদা সর্বদা তওবা-ইস্তিগফার করা কর্তব্য । আল্লাহ পাক বান্দার-তওবা ইস্তিগফারে বড়ই খুশি হন। এ জন্যই তো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেগুনা মাসূম হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক সত্তর বারেরও বেশি তওবা-ইস্তিগফার করতেন।

তওবা করলে আল্লাহ পাক খুশি হওয়ার কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা তওবাকারী নিজের ক্ষুদ্রত্ব এবং আল্লাহপাকের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ করে থাকে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে ছোট মনে করে বিনয় এখতিয়ার করে, আল্লাহ তা'আলা তার দরজা উঁচু করে দেন। সুতরাং মনে রাখতে হবে, তওবা মু'মিনের মর্যাদার প্রতীক-সাফল্যের সোপান।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে উপরোক্ত ঘটনা ও বর্ণিত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে শিক্ষা নিয়ে খাঁটি মনে তওবা করার তৌফিক নসীব করুন। আমীন॥*

স্মরণীয় বাণী

যে ব্যক্তি আমার দোষ ত্রুটি সম্পর্কে আমাকে অবগত করে তার উপর আল্লাহর রহমত হউক। – হযরত উমর (রাঃ)

* সহায়তায় : বেহেশ্‌তী খুশবু ।

www.smfoundationbd.com

৬

কবরের ভয়ঙ্কর শাস্তি

বাঁচার জন্য উদ্যোগ নিন আজ থেকেই

মানুষ মরণশীল। তাকে মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ অবশ্যই আস্বাদন করতে হবে। তবে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিংবা চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নাম মৃত্যু নয়; বরং এক জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার নাম মৃত্যু। এ জন্যেই মৃত্যুর অপর নাম ইন্তেকাল; যার অর্থই হচ্ছে স্থানান্তর হওয়া।

মৃত্যুর পর মানুষের আরেকটি জীবন আছে। সে জীবনেরও রয়েছে দু'টি ভাগ। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- কবরের জীবন। আর অপরটি হচ্ছে অনন্ত জীবন।

মৃত্যুর পর থেকে কবরের জীবন শুরু। এর শেষ কিয়ামত তথা হাশরের ময়দান কায়েম হওয়া পর্যন্ত। ব্যক্তির মৃত্যুর পর থেকে হাশরের ময়দানে উত্থিত হওয়া পর্যন্ত যে যেখানে, যে অবস্থাতেই থাকবে, সেটাই তার কবরের জীবন। চাই তাকে দাফন করা হোক কিংবা হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলুক; পুড়িয়ে ভস্ম করে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হোক অথবা অথৈ সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হোক। মোটকথা, সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, জীবন-মরণের প্রভু আল্লাহ তা'আলা তাকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তি প্রদান করবেনই।

হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত হওয়ার পর থেকে শুরু হবে অনন্ত জীবন। যে জীবনের কেবল শুরুই আছে, শেষ নেই। আদি আছে, অন্ত নেই। হাশরের ময়দানে ফয়সালা হওয়ার পর মানুষ অনন্ত-অসীমকাল ধরে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে অবস্থান করবে। জান্নাত হলো, চির শান্তিময় আরাম-আনন্দের স্থান। আর জাহান্নাম হলো, চির অশান্তিময় দুঃখ-কষ্টের স্থান।

মানুষের মৃত্যু যেমন সত্য, তার চেয়ে শতকোটি গুণ বেশি সত্য- কবরের ভয়ঙ্কর আজাব বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। মানুষ ও জিন ব্যতীত সকল প্রাণী এ শাস্তি দেখতে পায়। বিশেষ হিকমতের দরুন আল্লাহ তা'আলা কবরের আজাবকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন। কেননা, মানুষ যদি সচরাচর তা দেখতে পেত, তবে আত্মভোলা হয়ে পার্থিব কাজকর্ম ছেড়ে দিত। এমনকি ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মুর্দার দাফন করাকে চিরতরে বন্ধ করে দিত। তবে মানব হৃদয়ে আল্লাহর ভয়-ভীতি সৃষ্টি, আখিরাতের কথা স্মরণ, ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে অবহেলা দূরীকরণ ও কৃত অপরাধের প্রতি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তওবার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মহান রাব্বুল আলামিন মাঝে মধ্যে কবর আজাবের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে প্রকাশও করে থাকেন। বক্ষমান আলোচনায় পাকিস্থানের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা কেন্দ্র নশ্‌তর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডা. নূর আহমদ নূর লিখিত **"মওত আওর আযাবে কবরকে ইবরতনাক ওয়াকেয়াত"** নামক বিখ্যাত গ্রন্থসহ আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে কবর আজাবের কয়েকটি চরম সত্য ঘটনা পাঠকবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করছি।

(ক) ডা. নূর আহমদ নূর বলেন- গত কয়েক বছর আগের কথা। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে একটি জামাত নিয়ে আমি গিয়েছিলাম 'মানসেরা' নামক এলাকায়। গ্রামের একটি মসজিদে বয়ান হচ্ছিল। মসজিদের কাছেই কিছু লোক বসে গল্প করছিল। আমরা লোকগুলোকে মসজিদে এসে বয়ান শুনার দাওয়াত দিলাম। অনুরোধ করে বললাম, ভাইগণ! আপনারা মসজিদে এসে বয়ান শুনুন। এতে অনেক ফায়দা হবে। আল্লাহ তা'আলাও খুশি হবেন। হতে পারে এ অসিলায় আল্লাহ পাক আপনাদেরকে কিয়ামতের কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত দিয়ে দিবেন।

আমাদের অনুরোধে সকলেই মসজিদে চলে এল। কিন্তু একটি লোক সেখানেই ঠায় বসে রইল। মসজিদে এল না। কিছুক্ষণ পর লোকটি আমাদের কাছে এসে বলল, আমি আপনাদের কথা রক্ষা করতে পারিনি বলে লজ্জিত। আমি মা'জুর মানুষ। জন সমক্ষে গেলে মানুষের কষ্ট হয়। তাই আপনাদের অনুরোধ রাখতে পারিনি। তবে আপনারা চলে আসার পর কবরের আজাব সম্পর্কিত একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে

www.smfoundationbd.com

পড়ল। ভাবলাম, হৃদয় বিদারক এ ঘটনার দ্বারা হয়তো অনেক সংশয়বাদী লোকের সন্দিহান মনের বদ্ধ দুয়ার খুলে যেতে পারে। সুতরাং আপনারা চাইলে মর্মস্পর্শী এ ঘটনাটি আপনাদের শুনাতে পারি।

আমরা সকলেই এক বাক্যে বলে উঠলাম, অবশ্যই বলুন। এ ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু থাকতে পারে।

আমাদের কথায় তিনি একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বলতে লাগলেন- ১৯৬৫ সালের কথা। আমি তখন সেনাবাহিনীর একজন দুরন্ত সৈনিক। সে সময় পাক-ভারত যুদ্ধে এক পুরাতন কবরস্থানে একটি অস্ত্রাগার স্থাপন করা হয়েছিল। এ অস্ত্রাগার পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবক সৈন্য। যাদের মাঝে আমিও ছিলাম। আমরা দু'জন করে পালাক্রমে এ অস্ত্রাগার পাহারা দিতাম।

এক দিনের ঘটনা।

ভোরের হাওয়া বইছে। আকাশ রাঙ্গা করে উকিঁ দিয়েছে অরুণ-আলো। কুয়াশার ফাঁকে পাইন গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদু বাতাস শিহরণ জাগায় তার পাতায় পাতায়। হিম শীতল রাতের শিশির বিন্দুগুলো মুক্তার মতো চিকচিক করছে। সেদিন অন্য কয়েকজন সিপাইর সাথে আমিও এ অস্ত্র ডিপোর পাহারায় নিয়োজিত ছিলাম। তখন আমার বিশেষ কোনো কাজ ছিলনা। সঙ্গীরা ছোট্ট একটি তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমি রাইফেল কাঁধে নিয়ে কবরস্থানের মধ্যেই ঘুরাফেরা করছিলাম। হঠাৎ একটি পুরাতন কবরের ভিতর থেকে একটি ভীতিপ্রদ শব্দ আমার কানে এল। নির্জন কবরস্থানে এ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমি থমকে দাঁড়ালাম। মনে হলো, ভিতরে কেউ যেন হাড্ডি চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। আর বাহির থেকে সেই হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ শুনা যাচ্ছে।

হাড় ভাঙ্গার সেই হৃদয় কাঁপানো শব্দ শুনে একদিকে যেমন আমার মনে সীমাহীন ভীতির সৃষ্টি হলো, ঠিক তেমনি হৃদয়ের গভীরে জন্ম নিল অদম্য কৌতূহল। কিছুতেই আমি এ কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারলাম না। বারবার শুধু আমার জানতে ইচ্ছে করল, কোথেকে ভেসে আসছে এ ভীতিজনক আওয়াজ? এ নির্জন কবরের মাঝে কে বা কারা, কার

হাড্ডিগুলি ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে? কেনইবা তাদের এ অশুভ পরিণতি? কি ঘটনাই বা ঘটছে এ পরিত্যক্ত গহ্বরে?

কৌতূহলী মন ধীরে ধীরে আমাকে কবরের কাছে টানতে লাগল। আমি এক কদম দু'কদম করে ভীত-সন্ত্রস্ত মন নিয়ে সামনে এগুতে লাগলাম। চলতে চলতে কবরের একেবারে কাছে এসে সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজের উৎস এবং তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে বন্দুকের বাঁট দিয়ে এক এক করে সেটির ইট পাথর সরাতে লাগলাম। কবরের উপর থেকে ইট পাথর সরিয়ে যখন উহার মাটি সরাতে শুরু করলাম, তখন হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ ধীরে ধীরে আরও তীব্র ও ভয়ঙ্কর হতে লাগল। ফলে আমার আতঙ্ক ও কৌতূহল সমগতিতে দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেল। আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আবার মাটি খুঁড়তে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সেই কবরের ভেতরে মানব দেহের একটি কংকাল পড়ে আছে। আর সেই কংকালের উপর বসে আছে ইঁদুরের মতো অদ্ভুত প্রকৃতির একটি বিষাক্ত প্রাণী। এ বিষধর প্রাণীটি যখনই সেই কংকালটির গায়ে দংশন করে তখনই এর বিষক্রিয়ায় মৃতের আপাদমস্তকে খিঁচুনি শুরু হয়। অসহনীয় কষ্ট যাতনায় গড়াগড়ি খেতে থাকে তার পুরো দেহ। ফলে সংকুচিত হয়ে যায় তার দীর্ঘকায় শরীর।

আমি ব্যথাকরুণ দৃষ্টি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ এ মর্মান্তিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। মৃতের উপর এ প্রাণীটির এহেন নির্মম আচরণ প্রত্যক্ষ করে আমি নিজের মাঝে এক অপূর্ব করুণা ও সমবেদনা অনুভব করলাম। ভাবলাম, এ বিষাক্ত প্রাণীটি অহেতুক মুর্দারকে কষ্ট দিচ্ছে। আর তার দংশন যন্ত্রণায় মৃত ব্যক্তি ছটফট করছে। সুতরাং একে এখনই মেরে ফেলা উচিত।

যেই ভাবা সেই কাজ। আমি মুহূর্তকাল দেরি না করে রাইফেলের অগ্রভাগের সাহায্যে শক্ত আঘাতের মাধ্যমে উহাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলাম।

আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ বোধ হয় এটাই হয়েছে যে, আমি কেন পাপাচারী ব্যক্তির শাস্তির জন্য আল্লাহপাক কর্তৃক নির্ধারিত এ প্রাণীটিকে মারার জন্য ইচ্ছা করলাম। কেন আমি একটি বারের জন্যও চিন্তা করলাম না যে, এ-তো দুনিয়ার কোনো জন্তু নয় বরং এ হচ্ছে

খোদাদ্রোহী-জালেম ও পাপাচারীদের উচিত সাজা প্রদানের জন্য অন্য জগত থেকে আগত এক ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণী।

সে যাই হোক। আমি যখন উক্ত প্রাণীটির প্রাণবধ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সারলাম, ঠিক তখনই উহা অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত কবরের মাটি খানিকটা ঠিক করে আমি ফিরে চললাম। অনেক দূর যাওয়ার পর হঠাৎ পিছনে ফিরে দেখি সেই জন্তুটা আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমার হাতে রাইফেল ছিল। যদ্বারা সহজেই যে কোন হিংস্র প্রাণী মারতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে এত ভয় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম। বেশ কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম, জন্তুটি সমান বেগে আমার দিকে ছুটে আসছে। তাই আমি আবারো উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু সময় যতই যাচ্ছিল, জন্তুটি ততই আমার নিকটতর হচ্ছিল। কিছুতেই এর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। এবার জন্তুটি আমার একদম নিকটে এসে গেল। মনে হলো, এখনই সে আমার উপর লাফিয়ে পড়বে। তাই উপায়ান্তর না দেখে বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি পাশের একটি জলাশয়ে নেমে পড়লাম। কিন্তু আমার শেষ রক্ষা হলো না। হাঁটু পানিতে নামার সাথে সাথে দেখলাম, জন্তুটি পানির মধ্যে মুখ লাগিয়ে ক্রুদ্ধ শ্বাস ছাড়ছে।

জন্তুটি পানিতে মুখ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জলাশয়ের পানি গরম তেলের মতো টগবগ করে ফুটতে লাগল। আমার মনে হলো, পানিতে ডুবন্ত দেহের অংশটুকু যেন পুড়ে যাচ্ছে। তাই আমি এ যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে একটি বিকট চিৎকার দিয়ে উক্ত জলাশয় থেকে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে কিনারে চলে এলাম।

কিন্তু এ কী! আমার শরীরের প্রতি তাকিয়ে দেখি, ঐ প্রাণীটির ছোবলকৃত পানির নীরব ছোঁয়ায় আমার পুরো দেহ বিবর্ণ হয়ে গেছে। পা দুটোতে জ্বালাপোড়ার মাত্রা আরো তীব্র হয়েছে। গোটা দেহে শুরু হয়েছে অসহ্য-যন্ত্রণা। ফলে আমার পথচলা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হলো। ব্যর্থ হলাম সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে। ইতোমধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় সেই বিষাক্ত প্রাণীটি চোখের আড়ালে চলে যায়।

www.smfoundationbd.com

পরিশেষে, অবস্থা বেগতিক দেখে আমি আমার সহকর্মী ভাইদেরকে সজোরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। তারা আমার করুণ চিৎকার শুনে দৌড়ে এল। অতঃপর আমার এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে আমাকে তাড়াতাড়ি 'এরোটাবাদ' হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ আমার চিকিৎসা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পায়ের জ্বলন কমলো না। উপরন্ত ধীরে ধীরে পায়ের গোশ্‌তে পচন ধরল। অনবরত ঝরতে লাগলো, দুর্গন্ধময় পুঁজ আর পঁচা রক্ত।

এরোটাবাদ থেকে আমাকে রাওয়ালপিণ্ডি সি.এম.এইচ হাসপাতালে পাঠানো হলো। সেখানেও আমার রোগমুক্তির জন্য বহু রকম চেষ্টা তদবীর করা হলো। অত্যাধুনিক ঔষধপত্র খাওয়ানো হলো। কিন্তু সবই বিফলে গেল। অবস্থার উন্নতি হলো না বিন্দুমাত্রও।

এরপর দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ঐতিহ্যবাহী ক্যান্টনম্যান্ট হাসপাতালে আমার চিকিৎসা চলল। কিন্তু রোগারোগ্যের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তাই নিরাশ হয়ে শেষ চিকিৎসা হিসাবে আমাকে পাঠানো হলো আমেরিকার একটি অত্যাধুনিক হাসপাতালে। সেখানেও দীর্ঘদিন আমাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ঔষধ সেবন করানো হলো কিন্তু তাতেও কিছু কাজ হলো না; বরং অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, রোগ আরোগ্যের জন্য যতই ঔষধ সেবন করা হয়, রোগের মাত্রা ততই তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে।

ততক্ষণে আমার পায়ের অবস্থা নিঃশেষ প্রায়। রক্ত-মাংস সব পঁচে পুঁজের আকৃতিতে ঝরে গেছে। বাকি আছে কেবল হাড়গুলো। পঁচা মাংসে এমন দুর্গন্ধ হয়েছিল, যা সহ্য করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ডা. নূর আহমেদ নূর বলেন-নিজের সুদীর্ঘ দুর্ভোগের কাহিনী বলতে বলতে লোকটি আমাদের সবাইকে পায়ের পট্টি সরিয়ে নাঙ্গা হাড় দেখাল। কবর আজাবের সামান্য একটু পরশের যে ভয়াবহ নমুনা আমরা স্বচক্ষে দেখছিলাম, তার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া কয়েকদিন পর্যন্ত আমাদের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

৭

নামাজে অলসতার ভয়াবহ পরিণাম

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রা.) তাঁর জাওয়াজির নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, জনৈক মহিলা নামাজে অলসতা করত এবং মাঝে মাঝে নামাজ কাযা করে দিত। একদা উক্ত মহিলার ইন্তেকাল হলে যথারীতি তাকে কাফন ও জানাযা দেওয়া হয়। অতঃপর তাকে কবরে রাখার জন্য অন্য আরেক জনের সাথে তার ভাইও কবরে নামেন। যখন সে তার বোনকে কবরে রাখার জন্য নিচু হয়, তখন তার পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা কবরে পড়ে যায়। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে কেউ তা দেখতে পায়নি। পরে যখন মহিলার ভাই নিশ্চিত হলো যে, তার টাকা কবরেই পড়েছে, তখন সে কাল বিলম্ব না করে কবর খনন করতে শুরু করল।

কবরের মাটি সরানোর পর সে ভীষণ আশ্চর্য হলো। দেখলো, কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর তার বোন সেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাড়খার হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখা মাত্রই সে মাটি দিয়ে কবর বন্ধ করে ভয়ে আর্তচিৎকার করতে করতে বাড়ি ফিরে এল।

ছেলের গণবিদারী চিৎকার ও ভয়ার্ত চেহারা দেখে মা বলল, বেটা! কি হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন? তাড়াতাড়ি খুলে বল।

সে বলল, আম্মা! আমি তোমার মেয়ের কবরের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন দেখে এসেছি। মা! আমার বোন এমন কি পাপ করেছে, যার জন্য তার এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হচ্ছে?

ছেলের কথা শুনে মায়ের দু'চোখে বাধভাঙ্গা জলস্রোতের মতো অশ্রুধারা নেমে এল। গভীর বেদনা তার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলল। রুমালে মুখ মুছলেন তিনি। তারপর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

www.smfoundationbd.com

বাবা! আমার জানা মতে তোমার বোন বড় কোনো গুনাহের কাজ করেনি। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, সে মাঝে মাঝে নামাজে অলসতা করত। কাজের ব্যস্ততা কিংবা সামান্য কারণেই সে নামাজ কাযা করে দিত। আমার মনে হয়, নামাজের ব্যাপারে তার এই উদসীনতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাকে এই কঠিন শাস্তি দিচ্ছেন।*

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! একটু চিন্তা করে দেখুন যে, শুধু অলসতায় নামাজ কাযা করার দরুন এমন শাস্তি; তাহলে যারা একেবারেই নামাজ পড়ে না, তাদের অবস্থা যে কত করুণ ও শোচনীয় হবে তা কি সহজেই অনুমান করা যায় না?

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র.) তাঁর বিখ্যাত 'ফাযায়েলে নামাজ' নামক গ্রন্থে লিখেন- যে ব্যক্তি নামাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করে আল্লাহ পাক তাকে পনের প্রকার শাস্তি প্রদান করবেন। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে, তিন প্রকার মৃত্যুর সময়, তিন প্রকার কবরের ভেতর ও তিন প্রকার কবর থেকে পুনরুত্থানের পর।

দুনিয়াতে যে পাঁচ প্রকার শাস্তি দেওয়া হবে তা নিম্নরূপ ঃ

ক) তার জিন্দেগীর বরকত কেড়ে নেওয়া হবে। (অর্থাৎ সে যত টাকা-পয়সাই কামাই করুক না কেন, তাতে কোন বরকত হবে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে অঢেল সম্পদের মালিক হলেও তার অন্তর কখনোই অভাবশূন্য থাকবে না।)

খ) তার মুখমণ্ডল থেকে নেককার ও সৎকর্মশীল লোকদের জ্যোতি মুছে ফেলা হবে। (ফলে দীনদার লোকেরা দেখেই বুঝে ফেলবে যে, সে দীনদার বা ধর্মভীরু নয়)

গ) যে আমলই সে করুক না কেন, আল্লাহ পাক তার কোনো প্রতিদান দেন না।

ঘ) তার কোন দোয়া আসমানে উঠে না। অর্থাৎ কবুল হয় না।

* জাওয়াজির, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১২

www.smfoundationbd.com

ঙ) নেককার বান্দাদের দোয়া থেকেও সে কোনো ফল লাভ করে না। (অর্থাৎ নিজে নামাজ না পড়ে শুধু দোয়া করলে কিংবা অন্যকে দিয়ে দোয়া করালে সে দোয়া বিফলে যাবে।)

মৃত্যুর সময় যে তিন প্রকার আজাব দেয়া হবে তা নিম্নরূপ :

ক) সে বেইজ্জত ও অসম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে।

খ) ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাবে।

গ) পিপাসার্ত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। যদি বিশাল সমুদ্রের পানিও তাকে পান করানো হয়, তবুও তার তৃষ্ণা মিটবে না।

কবরে যে তিন প্রকার আজাব দেওয়া হবে তা নিম্নরূপ :

ক) তার জন্য কবর এত সংকীর্ণ হবে যে, বুকের হাড়গুলো একটি অপরটির মধ্যে ঢুকে যাবে।

খ) তাকে দংশন করার জন্য এমন একটি ভয়ঙ্কর সাপ প্রেরণ করা হবে, যার চক্ষুগুলো আগুনের মতো, নখরগুলো লৌহ সদৃশ। এত বড় দীর্ঘ যে, একদিনের রাস্তা অপেক্ষা বড়। আওয়াজ এত বিকট যে, তাকে বজ্রের মতোই মনে হবে। সাপটি বলতে থাকবে- আমার আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাকে ফজরের নামাজ নষ্ট করার দরুন সূর্যোদয় পর্যন্ত, যোহরের নামাজ নষ্ট করার দরুন আছর পর্যন্ত, আছরের নামাজ নষ্ট করার দরুন সূর্যাস্ত পর্যন্ত, মাগরিবের নামাজ নষ্ট করার দরুন এশা পর্যন্ত এবং এশার নামাজ নষ্ট করার দরুন ভোর পর্যন্ত দংশন করতে থাকি।

এ সাপটি যখন তাকে একবার দংশন করবে তখন সে সত্তর হাত মাটির নিচে চলে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে সে আজাবে গ্রেফতার থাকবে।

পুনরুত্থানের পর যে তিনটি আজাব হবে তা নিম্নরূপ :

ক) তার হিসাব অত্যন্ত কঠোরভাবে নেওয়া হবে।

খ) আল্লাহ পাক তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।

গ) অবশেষে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করে সেখানকার মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে। (এখানে সর্বমোট ১৪টি আজাবের কথা উল্লেখ আছে। সম্ভবত পনেরতম আজাবটি ভুলবশত রয়ে গেছে)

অন্য এক হাদীসে আছে- বেনামাজির মুখমণ্ডলে তিনটি লাইন লেখা থাকবে।

প্রথম লাইনে থাকবে- হে আল্লাহর হক নষ্টকারী। দ্বিতীয় লাইনে থাকবে- হে আল্লাহর অভিশপ্ত। তৃতীয় লাইনে থাকবে- দুনিয়াতে তুমি যেভাবে আল্লাহর হক নষ্ট করেছ, তেমনি তুমি আজ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।

নওফল ইবনে- মোয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাজও ছুটে গেল, তার যেন পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ সবকিছুই কেড়ে নেওয়া হল। (ইবনে হাব্বান)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি সফর থেকে এসে দেখে যে, জালিমরা তার সমুদয় ধনসম্পদ আত্মসাৎ করেছে এবং পরিবারের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে গেছে তখন এ সর্বহারা লোকটি যে দুঃখ-দৈন্যের সম্মুখীন হবে, এক ওয়াক্ত নামাজ নষ্টকারী তদ্রূপ বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! হাদীসের কিতাবসমূহে বেনামাজির কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি বেনামাজির শাস্তি সম্পর্কিত একটি বাস্তাব ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। যদি উল্লিখিত হাদীসসমূহ ও ঘটনা পাঠ করে আজ থেকেই আমরা নিয়মিত নামাজ পড়তে শুরু করি তবেই আপনাদের পড়া ও আমার লেখা সার্থক হবে- দেখতে পাবে সফলতার সোনালী মুখ। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। আমীন॥

৮

ব্যভিচারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

ডা. নূর আহমদ নূর বলেন, একদা জনৈক ডাক্তার শয়তানের ধোঁকা ও স্বীয় প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণায় পড়ে ব্যভিচারের ন্যায় জঘন্য অপরাধ করে বসেন। এ কারণে তাকে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল তা তিনি ব্যক্ত করেন এভাবে-

১৯৬১ সাল। আমি তখন এক হাসপাতাল ওয়ার্ডে কর্মরত। একদিন রাতে আমি ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ স্বপ্নে দেখি, কে যেন এসে আমাকে একটি কবরে নিয়ে গেল। সেখানে আমি জনৈক মৃত ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। সে ভয়াবহ শাস্তির অসহ্য যন্ত্রণায় বারবার ককিয়ে উঠছে। জবাইকৃত মুরগির মতোই ছটফট করছে। খোলা থাকা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। ব্যথার তীব্রতায় তার বাহুদ্বয় এবং পা দু'টি বিরামহীনভাবে নড়াচড়া করছে।

আমি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ব্যথিত হৃদয় নিয়ে তার এ করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিলাম। কিন্তু তাকে সাহায্য করার মতো কোনো সুযোগ আমার ছিল না। কিছুক্ষণ পর ব্যথার পরিমাণ কিছুটা কমে এল। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আমিও খুশি হলাম। কিন্তু অল্প সময় যেতে না যেতেই দেখলাম, নীল চক্ষু বিশিষ্ট কুৎসিত চেহারার এক অদ্ভুত লোক দৃঢ়পদে তার দিকে অগ্রসর হলো। লোকটির হাতে রয়েছে লৌহদণ্ডের ন্যায় নাম না জানা এক বিষাক্ত বস্তু। সে মৃতের কাছে এসেই তার মূত্রনালী দিয়ে সেই বস্তুটি এক ধাক্কায় সম্পূর্ণরূপে ঢুকিয়ে দিল। ফলে মৃত ব্যক্তিটি পূর্বের চেয়ে আরো বেশি পরিমাণে ছটফট করতে লাগল। তার এ সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট-যাতনা দেখে আমি আর নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, ভাই! তাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? কী অপরাধ সে করেছে?

লোকটি জবাবে বলল, " সে দুনিয়াতে ব্যভিচার করত। অন্যায়ভাবে মেয়েদের সম্ভ্রম লুটে নিত। পরস্ত্রীর সাথে নিজের নাপাক

ইচ্ছাকে চরিতার্থ করত। তাই মৃত্যুর পর থেকেই তাকে এ ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।"

আমি অনেকক্ষণ ধরে এ করুণ দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। এ মর্মস্পর্শী ঘটনা আমার হৃদয়ে সীমাহীন করুণার সৃষ্টি করল। মৃতের প্রতি এ বেদনাদায়ক আচরণ প্রত্যক্ষ করে আমার অন্তরে অতীতের সমস্ত পাপের কথা জেগে উঠল। তাই আমিও আমার পরিণতির কথা ভেবে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

আমার অন্তরে দুশ্চিন্তার কালো-স্রোত বয়ে চলছে। তার একটা ছাপ সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমার মুখমণ্ডলে। কেমন যেন ভীত-বিহবল হয়ে পড়েছি আমি। অস্থিরতার কালো মেঘ ঢেকে নিয়েছে আমাকে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ একটি শক্ত হাতের প্রচণ্ড আঘাত আমার চিন্তার জাল ছিন্ন করে দিল। আমি কিছু বুঝে না উঠতেই দেখলাম, একটি লোক আমাকে ধরে জোরপূর্বক মাটিতে শুইয়ে দিল। তারপর লৌহদণ্ডের ন্যায় সেই কঠিন বস্তুটি আমার মূত্রনালী দিয়েও প্রবেশ করিয়ে দিল। ফলে ব্যথার তীব্রতায় আমি পানিবিহীন মাছের মতোই লাফাতে শুরু করলাম। সেই স্বাপ্নিক ঘটনার কথা মনে হলে আজো আমার শরীর রীতিমত শিউরে উঠে।

যা হোক, দীর্ঘ সময়ব্যাপী অসহনীয় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করার পর সহসা আমার স্বপ্ন ভাঙ্গল। আমি অনুভূতি ফিরে পেলাম। ফিরে এলাম এ ধরাপৃষ্ঠে। কিন্তু তখনো আমার শরীরে ব্যথার যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বিষাক্ত তীরের আঘাতে মূত্রনালী ভেদ করে বিদ্যুৎ গতিতে যেন প্রস্রাবের পানিতে গোটা বিছানা ভিজে গেছে। ভিজে গেছে গৃহ শয্যার মধ্যমণি বালিশটি পর্যন্ত।

স্বপ্নীল জগতে ঘটে যাওয়া এ ঘটনার পর হতে যখনই আমি প্রস্রাব করতাম, তখনই আমার মূত্রাশয় থেকে বেরিয়ে আসত এক প্রকার লাল রংয়ের রক্তিম পানি। ফলে রক্তশূন্যতার দরুন আমার শরীর অল্প দিনের মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়ল।

এ রোগ থেকে মুক্তির জন্য আমি বড় বড় ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়েছি। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি অনুযায়ী বহু উন্নতমানের চিকিৎসা গ্রহণ করেছি। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। এমনকি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

ডাক্তারগণ এ রোগ সৃষ্টির কারণ ও উৎস উদ্‌ঘাটনেও চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমি নিরাশ হয়ে চাকরি থেকে অব্যহতি নিয়ে বাড়ি চলে আসি। বাড়ি আসার পর আমার মনে একটি নতুন চিন্তা জাগল। ভাবলাম, জৈবিক কামনার নিয়ন্ত্রণহীনতাই আমার এ রোগের মূল কারণ। সুতরাং যে খোদা এ পাপের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এতবড় রোগ দিয়েছেন, যদি আমি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তবে তো তিনিই আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।

এ চিন্তা মাথায় আসার সাথে সাথে আমি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে অবুঝ বালকের মতো কাঁদতে লাগলাম। অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কাছে নিজের গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমা চাইলাম। তাঁকেই একমাত্র মুক্তিদাতা মনে করে রোগমুক্তির জন্য দোয়া করলাম। এভাবে কয়েকদিন আমার এই অশ্রুভেজা আর্তনাদ, অনুতপ্ত হৃদয়ের খালেস তওবা ও বিনীত প্রার্থনার বদৌলতে আল্লাহ পাক আমাকে এ দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহর রহমত ও তাঁর অসীম করুণায় আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এ জন্য আমি তাঁর দরবারে জানাই লাখো কোটি শুকরিয়া।

মুহতারাম বন্ধুগণ! আলোচ্য ঘটনা পাঠ করে আমরাও যদি আমাদের জৈবিক কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি এবং এক্ষেত্রে কঠোর সংযম প্রদর্শন করি তবেই তো আমরা এই মারাত্মক অপরাধের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে পারব। মনে রাখবেন, জৈবিক কামনা নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ কয়েকটি উপায় হলো- ১) দৃষ্টির কঠোর হেফাজত করা ২) নির্জন স্থান কিংবা লোকজনের উপস্থিতিতেও কোনো বেগানা মেয়ের সাথে অবস্থান না করা ৩) অশ্লীল বই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠ না করা ৪) টিভি, ভিসিডি, সিনেমা না দেখা। এমনকি কোনো মেয়ের ছবির দিকেও না তাকানো ৫) বিনা প্রয়োজনে কোনো মেয়ের সাথে কথা না বলা। ৬) দাড়িবিহীন সুন্দর বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা ৭) চরিত্রহীন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব না করা। ৮) সর্বদা আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা। ৯) ধর্মীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক নসীব করুন। আমীন॥*

* সূত্র : মওত আওর আযাবে কবরকে ইবরতনাক ওয়াকেয়াত।

www.smfoundationbd.com

৯

এতিমের প্রতি ভালবাসা একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত

ছোট্ট এক বালক। এতিম। অসহায়। বেশ কিছুদিন পূর্বে তার পিতামাতা ইন্তেকাল করেছেন। ফলে দীর্ঘদিন ধরে সে মাতাপিতার স্নেহের ছায়া থেকে বঞ্চিত।

তখন পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ। অল্পক্ষণের মধ্যেই পূর্ণ চন্দ্রের জোছনার আলো মদীনার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

এতিম বালকটি এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসছে। তার মনটি আজ ভাল নেই। কারণ তার ধারণা- সে আজ জুলুমের শিকার। আর সেই জুলুমের বিচারপ্রার্থী হয়েই সে আজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গমন করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে ডেকে নিয়ে কাছে বসালেন। সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বড়ই মমতার স্বরে বললেন- বাবা! কি মনে করে এসেছ? কি প্রয়োজন তোমার?

ছেলেটি একজন লোকের নাম নিয়ে বলল, তিনি জোরপূর্বক আমার খেজুর বাগান দখল করে নিয়েছেন। আপনার নিকট আমি এর বিচারপ্রার্থী।

অভিযোগ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাবা! তুমি কোনো চিন্তা করো না। অবশ্যই তুমি সুবিচার পাবে। যদি সাক্ষ্য প্রমাণে তোমার অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে খেজুর বাগান তুমি ফিরে পাবেই।

নবীজীর কথায় ছেলেটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মনের অস্থির ভাব অনেকটা কেটে গেল। সে শান্ত হয়ে নবীজীর পাশে আগের মতোই বসে রইল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহূর্তকাল সময় নষ্ট করলেন না। তিনি সাথে সাথে লোক পাঠিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। তারপর উভয়ের বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শুনলেন। সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করলেন। সব কিছু শুনে শেষ পর্যন্ত ইনসাফের ভিত্তিতে তিনি রায় ঘোষণা করলেন, তা ঐ এতিম বাচ্চার বিরুদ্ধেই গেল। কেননা, সাক্ষ্য প্রমাণ ও অন্যান্য অবস্থাদি পূর্ণ অবগত হওয়ার পর রাসূল সালল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে একথা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এতিম ছেলের বাগান জোরপূর্বক নিয়ে যায়নি বরং সে তার নিজের বাগানেই দখল বসিয়েছে।

ফায়সালা শুনে এতিম ছেলেটি বিরামহীনভাবে কাঁদতে লাগল। তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ দু'টোও অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠল। মনে হলো, ছেলেটির কান্নার আওয়াজ তাঁর হৃদয়ে যেন প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে। তিনি ছেলেটির দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যার পক্ষে রায় ঘোষণা করলেন তাকে বললেন- 'ভাই! ফায়সালা তো তোমার পক্ষেই হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তুমি বাগানটি এ এতিম বাচ্চাটিকে দান করে দিতে, তবে কতই না চমৎকার হতো। মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমাকে জান্নাতে এর চাইতে আরো অনেক উন্নত, সুসজ্জিত ও মনোরম বাগান দান করতেন।'

লোকটি নবীজীর কথা শুনল। কিন্তু কোনো ভাবেই সে বাগানটি দান করতে রাজী হলো না।

সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন হযরত আবূ দারদা (রা.)। একটি এতিম বালকের করুণ অবস্থা এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর একটি আকাঙ্খা অপূর্ণ হতে দেখে তিনি মনে খুব ব্যথা অনুভব করলেন। ভাবলেন, আমি বেঁচে থাকতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকবে- এ কিছুতেই হতে পারে না। উপরন্তু এ আকাঙ্খা ও প্রার্থনা তো নিজের জন্য নয়, বরং একটি অসহায় এতিম বাচ্চার জন্য।

কথাগুলো চিন্তা করতেই তাঁর হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি একত্রে সাড়া দিয়ে উঠল। তিনি লোকটিকে অনমনীয় দেখে মজলিশের বাইরে নিয়ে তাকে চুপে চুপে বললেন, আচ্ছা ভাই! তোমার এ বাগানটির পরিবর্তে আমার অমুক বাগানটি যদি তোমাকে দিয়ে দেই, তবে কি তুমি তোমার বাগানটি আমাকে দিয়ে দিতে রাজি হবে?

হযরত আবূ দারদা (রা.)-এর প্রস্তাব লোকটি সানন্দে গ্রহণ করলো। বলল, যদি বিনিময়ে আমাকে আপনার ঐ বাগানটি দিয়ে দেন তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে আমার বাগানটি দিয়ে দিব। এ প্রস্তাব খুশি মনে কবুল করার কারণ হলো, হযরত আবূ দারদা (রা.) যে বাগানটি বিনিময় স্বরূপ দিতে চাইলেন, সেটি এ বাগানের তুলনায় অনেক উন্নত ও ভালো ছিল।

লোকটির সাথে কথা শেষ করে হযরত আবূ দারদা (রা.) তৎক্ষণাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হলেন। বললেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন। নিষ্পলক নয়নে তাকালেন আবু দারদা (রা.)-এর মুখের দিকে। তারপর বললেন, আবু দারদা! বল তুমি কি বলতে চাও।

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) এতিম বালকটির দিকে আরেকবার স্থির দৃষ্টিতে মেলে ধরলেন। দেখলেন, করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বালকটি। দু'চোখে তার অশ্রু। ব্যথার ছোয়া ফুটে আছে সমস্ত চেহারা জুড়ে।

তিনি ব্যথাকরুণ দৃষ্টি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে চোখ ফিরালেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে বাগানটি ঐ এতিম ছেলেটিকে দান করতে চেয়েছিলেন, সে বাগানটি যদি

আমি ঐ এতিম বাচ্চাটিকে দান করে দেই, তবে কি আমি তার পরিবর্তে জান্নাতে বাগান লাভ করতে পারব?

হযরত আবূ দারদা (রা.)-এর কথায় আনন্দে আপ্লুত হয় রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয়-মন। এক অনাবিল শান্তির প্রলেপ ছোঁয়া দিয়ে যায় তাঁর অন্তরের গহীন কোণে। ঘন মেঘের অন্তরাল থেকে শশীকলা যেমন পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অশ্রুসিক্ত মলিন মুখে স্বর্গীয় এক হাসির আভা ফুটে উঠে। তাঁর সুপ্ত হৃদয়ে বয়ে চলে খুশির বান। তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই লাভ করবে।

হযরত আবুদ দারদা (রা.) এর মুখেও ফুটে উঠে মুধুময় তৃপ্তির হাসি। হৃদয়ে তাঁর অফুরন্ত আনন্দোচ্ছাস। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি লোকটির বাগান আমার বাগানের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছি। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এ বাগানটি এ এতিম ছেলেটিকে দান করে দিয়েছি।

হযরত আবূদ দারদা (রা.)-এর এ অপূর্ব বদান্যতায় এতিম বালকটির বিষাদ ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে অপরিসীম আনন্দ ও খুশির বন্যা। অনুপম এক প্রশান্তি দোলা দিয়ে যায় তার অন্তরের মনি কোঠায়। চোখের কোণে ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা আনন্দাশ্রু। সেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও। দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাঁর মোবারক চেহারা।

এভাবেই দুঃস্থ, গরিব, এতিম ও অসহায়দের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতেন প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত সাহাবায়ে কেরাম।

প্রিয়নবীর প্রিয় উম্মত ও সাহাবায়ে কেরামের একান্ত অনুসারী হিসেবে সর্বোপরি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অসহায়, দুর্বল ও অনাথদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য নয় কি?

১০

পাঁচশে পাঁচশ

ঈদের রাত। গাঢ় অন্ধকারে গোটা পৃথিবী আচ্ছন্ন। আকাশে দু'একটা তারকা ক্ষুদে বিড়ালের চোখের মতো মিটমিট করে জ্বলছে। বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নড়ছে না। চারদিকে একটি গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ। এছাড়া কোনো শব্দই যেন নেই দুনিয়ায়।

ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে গভীর ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.)। ঈদের রাত্র অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ হওয়ায় অন্যান্য সময়ের তুলনায় একটু বেশি পরিমানে জিকির, তিলাওয়াত ও নামাজে মশগুল ছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন পূর্ণ রাত্রটিই মহান প্রভুর ইবাদতে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু হঠাৎ দরজায় কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তারপর সালাম ও ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.) জিজ্ঞেস করলেন, কে? আগন্তুক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, বড় আশা নিয়ে আপনার দরবারে এসেছি। অনুমতি পেলে ভেতরে এসে ধীরস্থিরভাবে বিষয়টি খুলে বলতে চাই। তার কণ্ঠে বিনয়ের স্বর।

হযরত ওমর (র.) ভাবলেন, লোকটি হয়তো কোনো বিপদে পড়ে আমার নিকট এসেছে। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আসুন। ভেতরে এসে শান্তভাবে আপনার যা বলার বলুন।

লোকটি ধীর পদে ঘরে প্রবেশ করল। তারপর দু'ফোঁটা অশ্রু ছেড়ে করুণ কণ্ঠে বলল, হযরত! আগামীকাল ঈদ। এদিনে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নতুন জামা-কাপড় পরিধান করে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। আমারও কয়েকটি ছোট বাচ্চা আছে। তাদেরকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। কিন্তু আফসোস ও পরিতাপের বিষয় এই যে,

এখনো পর্যন্ত আমি এতটুকু অর্থ জমা করতে সক্ষম হয়নি, যদ্বারা তাদেরকে আমি স্বল্প মূল্যের কোনো কাপড়- চোপড়ও কিনে দিতে পারি। হুজুর! আমি নিতান্তই একজন নিঃস্ব ও অসহায় মানুষ! কিন্তু অবুঝ শিশুরা তো আর সেকথা বুঝে না। বুঝানোও যায় না তাদেরকে। ঈদের দিন নতুন কাপড় না পেলে তারা মুখ ভার করে গাল ফুলিয়ে বসে থাকবে। খানা-পিনা বন্ধ করে বাড়ির বাইরে চলে যাবে । বাপ হয়ে এ অবস্থা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে পারব না আমি। তাই কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার প্রতি একটু সুদৃষ্টি দান করেন, তবে আমিও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আপনাদের সাথে ঈদের আনন্দে শরিক হতে পারতাম।

কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনলেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.)। তারপর ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে তাকালেন আগন্তুকের মুখের দিকে। পানি ভরা আকাশের মতোই ছল ছল করে উঠে তার চোখ দু'টো। লোকটির করুণ মর্মস্পর্শী অবস্থা তাঁর হৃদয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। গুমড়ে কেঁদে উঠে মন। কিন্তু লোকটি তো জানে না যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমানের অবস্থাও প্রায় তারই মতো। তিনি ঈদ উপলক্ষে নিজের ছেলে-মেয়েদের নতুন জামা-কাপড় কিনে দেওয়ার জন্য অনেক কষ্ট ও চেষ্টা-তদবীর করে মাত্র পঁচিশ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) জমিয়েছেন। তার ইচ্ছে ছিল, এখনই তিনি বাজারে গিয়ে কিছু কাপড়-চোপড় কিনবেন। তারপর পূর্বের ন্যায় ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত হয়ে যাবেন। দিনের বেলা বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। কেননা, তখন পর্যন্ত সকল ছেলে-মেয়েকে ন্যূনতম মূল্যের কাপড় কিনে দেওয়ার মতো অর্থও তাঁর হাতে ছিল না।

যা হোক, হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.) লোকটির মলিন চেহারা পানে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। ভাবলেন, নিজের তুলনায় অপরের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়াইতো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ। এটাইতো ইসলামের অনুপম শিক্ষা। যদি এ মুহূর্তে আমি লোকটির হাতে আমার জমানো দিরহামগুলো উঠিয়ে না দেই, তবে তো অপরের প্রয়োজনের তুলনায় নিজের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিলাম, যা সরাসরি ইসলামি

আদর্শের পরিপন্থি। যদি হাশরের ময়দানে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করে বসেন- হে আব্দুর রহমান! তোমার নিকট এক অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তি বড় অসুবিধায় পড়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু সেদিন নিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে তাকে তুমি সাহায্য করনি, কয়েকটি দিরহাম দান করে তার বেদনাময় চেহারায় হাসি ফুটাতে চেষ্টা করনি- তাহলে আমি কি জবাব দিব। কিভাবে আমি নবীজীর সামনে মুখ দেখাব। কিভাবে তাঁর একান্ত অনুসারী হিসেবে নিজের পরিচয় দিব।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.)-এর চোখ দু'টো অশ্রুসজল হয়ে উঠল। একটা অব্যক্ত বেদনা তার গোটা অন্তরটাকে নিষ্পেষিত করে চলল। বুক চিরে বেরিয়ে এল একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস। অন্তরের ব্যথা পরিস্ফুট হয়ে উঠল তাঁর কোমল সুন্দর নূরানী মুখমণ্ডলে।

আগন্তুক লোকটি হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.)-কে চুপ থাকতে দেখে বলে উঠলেন- হযরত! কিছু দিতে মনে চাইলে দিয়ে দিন। অন্যথায় আমি চলে যাই।

লোকটির কথায় হযরত ওমর (র.) সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি বহুদিন কষ্ট করে জমানো পঁচিশটি দিরহামই লোকটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন-নাও বাবা! এগুলো নিয়ে যাও। এ দিয়ে তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদের ঈদের নতুন জামা-কাপড় খরিদ করে দাও।

লোকটি দিরহামগুলো পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলো। একটা অনাবিল আনন্দ তার মনের সমস্ত ব্যথাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল। মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। সে দেরি না করে বিদায় নিয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা দিল।

এদিকে লোকটিকে বিদায় দিয়ে হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.) পূর্বের ন্যায় ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, আল্লাহ পাক ইচ্ছে করলে আমার জন্য এর চেয়েও উত্তম কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান দয়ালু দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমানের এ বদান্যতায় সীমাহীন আনন্দিত হলেন। কারণ, একজন দুঃস্থ মানবের মলিন মুখে হাসি ফুটাতে তিনি নিজের কষ্টার্জিত অর্থের সবটুকুই বিলিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাকে সহযোগিতা করা এবং তার মুখে হাসি ফোটানোর দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করলেন।

আগন্তুক লোকটি চলে গেছে বেশি সময় হয়নি। হয়তো এখনো বাজারেও পৌঁছতে পারেনি। এরই মধ্যে অপর এক অপরিচিত ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.)-এর খেদমতে হাজির হলো। সে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে সালাম দিল। মুসাফাহা করল। অতঃপর তাঁর প্রতি এত অধিক সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করতে লাগল যে, ভক্তির আতিশয্যে লোকটি তাঁর পদচুম্বন করল। চুমো খেল হাতে ও কপালে।

লোকটি কে? কোত্থেকে এল? কেন সে এমন করছে? এর কিছুই বুঝতে পারলেন না হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.)। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ভাই! তোমার নাম কি? তোমার ঠিকানা কোথায়? কেন তুমি আমার কাছে এসেছ?

লোকটি এবার শান্ত কণ্ঠে বলল, হুজুর! আমি এক সময় আপনার পিতার গোলাম ছিলাম। অর্থের প্রতি প্রচণ্ড লোভ ছিল আমার। ফলে এ লোভই একদিন আমাকে অন্যায় পথে পা বাড়াতে প্ররোচিত করে। আমি লোভের বশবর্তী হয়ে এতটাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম যে, ভাল-মন্দ বিচার করার মতো বুদ্ধি আমার তখন ছিল না। তাই একদিন আপনার পিতার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পঁচিশটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

এ ঘটনার পর অনেক বছর গড়িয়ে গেছে। এখন আমার বুঝে এসেছে যে, সে কাজটি আমার জন্য আদৌ ঠিক হয়নি। কারণ তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আমার যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করতেন। কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা প্রায়ই আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করতেন। তাঁর নির্মল আদর-সোহাগ কখনোই ভোলার মত নয়। আমি চিন্তা করে দেখলাম, এমন মহানুভব মনিবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, তাঁর দিনার

নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সাধারণ কোন অন্যায় নয়। আমার মতে, এ অন্যায় অন্যান্য যে কোনো অপরাধের চেয়ে অনেক বড়।

হযরত! উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার পিতার ইন্তেকালের পর আপনিই হলেন তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পত্তির মালিক। তাই আমি সে দিনারগুলো আপনাকে দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চাই। দয়া করে আপনি এগুলো গ্রহণ করুন। আর আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে আপনার গোলাম হিসেবে থাকবার সুযোগ দিন। কথা শেষ করে লোকটি হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.) - এর হাতে পঁচিশটি দিনার তুলে দিল।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.) পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ভক্তিভরে তার কৃতজ্ঞতা জানালেন। তাঁর বুঝতে মোটেও অসুবিধা হলো না যে, এসব কিসের বদলে হচ্ছে, কোত্থেকে এল এসব সুফল ও বরকত। তিনি মুদ্রাগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন- মহান কুদরতওয়ালা দয়ামত আল্লাহ পঁচিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে আমাকে পঁচিশটি স্বর্ণমুদ্রা লাভের সুযোগ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর পক্ষ থেকে সম্মানজনক হাদিয়া। কেননা, দীর্ঘদিন পূর্বে আমার পিতার হাত থেকে চুরি হয়ে যাওয়া দিনার, আজ আমি ফিরে পাব-এ আমার কল্পনায়ও ছিল না। অতঃপর তিনি সাথে সাথে গোলামটিকে আজাদ করে দিলেন। বললেন, যাও, তুমি এখন মুক্ত-স্বাধীন। যেখানে মনে চায় সেখানেই চলে যাও। তোমার প্রতি আমার কোনো দাবি নেই। গোলাম মুক্তির বার্তা শুনে যার পর নাই আনন্দিত হয়ে আপন গন্তব্যে চলে গেল।

এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল, আল্লাহর পথে দান করলে এর বিনিময় দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। কম কিংবা সমান তো নয়ই, বরং অনেক বেশি। যেমন হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান (র.) পঁচিশটি রৌপ্যমুদ্রার বদলে পঁচিশটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছেন। রূপা আর সোনার মাঝে পার্থক্য কতটুকু তা সকলেই জানেন। সুতারাং দান করলে সম্পদ কমে যাবে এরূপ ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। হাদীস শরীফে রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন-"দান করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা কমে যেতে দেখা যায়।" হে করুণাময় খোদা! তুমি লেখক-পাঠক সবাইকে বুঝার তৌফিক দাও। আমীন॥

www.smfoundationbd.com

১১

কৃতজ্ঞতার উত্তম প্রতিদান

বিস্তৃত বালুকাময় বেলাভূমি। মাঝে মঝে ছোট ছোট টিলা আর ঝোপঝাড়। একটু দূরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানা পাহাড় সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে।

হযরত মূসা (আ.)-এর জামানা। তিনি আল্লাহর প্রিয় নবী, মহান রাসূল। প্রায়ই আল্লাহর সাথে তাঁর কথাবার্তা হয়, বাক্য বিনিময় হয়। এ জন্যে তিনি দূরে বহু দূরে অবস্থিত তূর পাহাড়ে চলে যান। সেখানেই তাঁর আলাপ আলোচনা চলে।

একদিন মূসা (আ.)-কে আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য তূর পাহাড়ে চললেন। সম্পূর্ণ একা। ভক্তবৃন্দের কেউ সাথে নেই। পথিমধ্যে তিনজন লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তন্মধ্যে দু'জন পুরুষ একজন মহিলা।

প্রথম ব্যক্তি বিশাল ধন-ঐশ্বর্যের মালিক। কোনো অভাব নেই তার। সে হযরত মূসা (আ.) দেখে বলল, হযরত! কোথায় যাচ্ছেন?

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তূর পাহাড়ে আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি।

সে বলল, আজ বহুদিন যাবৎ একটি কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ জন্য আপনাকে আমি মনে মনে তালাশ করছি। আপনি যেহেতু আল্লাহ পাকের সাথে আলাপ করতে যাচ্ছেন, তাই আসার পথে আমার মনের কথাটুকু আল্লাহর নিকট খুলে বলবেন। কথাটি হলো, আল্লাহ পাক আমাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছেন। আমার টাকা-পয়সা ও সম্পদের

www.smfoundationbd.com

পরিমাণ এতই বেশি যে, এগুলো সামলে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমনকি এ বিশাল পরিমাণ ধন-দৌলতের হিসেব রাখতে গিয়ে আমি ঠিকমত আল্লাহ তা'আলার জিকিরও করতে পারি না। অনেক সময় ইবাদতেও কমতি এসে যায়। তাই আপনি অনুগ্রহ করে আল্লাহ তা'আলাকে বলবেন, তিনি যেন আমাকে এমন কোনো উপায় বাতলে দেন, যা করলে আমার সম্পদ কমে এমন পর্যায়ে চলে আসে যা নিয়ন্ত্রণে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়।

হযরত মূসা (আ.) 'ঠিক আছে বলব' বলে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন।

কিছু দূর যাওয়ার পর এক দরিদ্র মহিলা তাঁকে বলল, হুজুর! মনে হয় তূর পাহড়ে যাচ্ছেন। সেখানে নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে আপনার কথা হবে।

হযরত মূসা (আ.) বললেন, হ্যাঁ, এ জন্যেই যাচ্ছি।

মহিলা বলল, হুজুর! আমি আপনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কথাটি হলো, আমার জন্য এমন কোনো পন্থা আছে কি, যা অবলম্বন করলে আমার এ গরীবি হালত পরিবর্তন হয়ে যাবে? হুজুর! আমি নিতান্ত অসহায়। একেবারে নিঃস্ব। ধন-সম্পদ বলতে কিছুই নেই আমার। এই যে জীর্ণ-শীর্ণ ছোট্ট কুঁড়ের ঘরটি দেখতে পাচ্ছেন, এ-ই আমার নিবাস, একমাত্র সম্বল। আমার মনে হয়, আমার মতো অসহায় ও দরিদ্র নারী দুনিয়াতে আর কেউ নেই। আমি আশা করি আপনি এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন।

হযরত মূসা (আ.) মহিলার কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর আল্লাহর নিকট তার আবেদনটি পৌঁছবার আশ্বাস দিয়ে সামনে চলতে লাগলেন।

আরো কিছুদূর চলার পর হাত-পা কাটা আরেকজন লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। বেচারার অবস্থা দরিদ্র মহিলাটির চাইতে অনেক বেশি করুণ। তার দুরবস্থার দিকে তাকালে চোখে পানি এসে যায়। মনের অজান্তেই দু'গণ্ড বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরতে থাকে। কেননা, লোকটির হাত-পা যেমন নেই তেমনি দেহে গোশ্তও নেই। দেখলে মনে হবে,

কতগুলো হাড্ডি যেন চামড়া দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তার মাথায় চুল নেই। চোখগুলো গর্তের ভিতর ঢুকে গেছে।

সে হযরত মূসা (আ.)-কে দেখতে পেয়ে কাতর স্বরে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমার কোনো আবেদন নেই। নেই কোনো চাওয়া-পাওয়াও। উপরন্তু এ করুণ অবস্থার জন্য মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগও নেই। তবে তূর পাহাড়ে গিয়ে আপনি শুধু পরম দয়ালু মহান আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ায় আমাকে এভাবে রাখায় তাঁর উদ্দেশ্য কি? কেন তিনি আমাকে এভাবে রেখেছেন? তিনি আমাকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? এর জবাবে আল্লাহ পাক কী বলেন, মেহেরবানী করে ফেরার পথে আমাকে একটু জানিয়ে যাবেন, এই আমার অনুরোধ।

হযরত মূসা (আ.) তাকেও পূর্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় আশ্বাস দিলেন। তারপর পুনরায় চলতে চলতে এক সময় গিয়ে তূর পাহাড়ে হাজির হলেন।

তূর পাহাড়ে এসে অন্যান্য দিনের মতো আজও হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বললেন। তারপর ফেরার পূর্বে এক এক করে তিন ব্যক্তির আবেদনের কথাও জানালেন।

আল্লাহ তা'আলা ধনী ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে বললেন, তুমি লোকটাকে বলে দিও, আমি তাকে সহায়-সম্পত্তি ও ধন-ঐশ্বর্যের যে নিয়ামত দান করেছি সে যেন উহার নাশুকরী করে; অকৃতজ্ঞ হয়। এতেই তার সম্পদ কমে যাবে।

আর গরিব মহিলাকে বলিও, তাকে আমি যে অবস্থায় রেখেছি, সে যেন এ অবস্থায় থেকেও আমার শুকরিয়া আদায় করে। তাহলে অল্প দিনের মধ্যেই তার অবস্থার উন্নতি ঘটবে। দূর হয়ে যাবে তার ফকীরি অবস্থা।

সর্বশেষে হাত-পা কাটা পঙ্গু লোকটির ব্যাপারে বললেন- তাকে বলিও, জাহান্নামের দেয়ালে একটি ছিদ্র আছে। আমি তাকে দিয়ে ঐ ছিদ্র বন্ধ করব। এ কাজের জন্যই আমি তাকে সৃষ্টি করেছি।

হযরত মূসা (আ.)-এর সব কাজ শেষ। এবার ফেরার পালা। তিনি আপন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে সর্বপ্রথম দেখা হলো, পঙ্গু লোকটির সাথে। তিনি তাকে বললেন, ভাই! আমি তোমার

ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করেছি। তোমার সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন, তা মোটেও আনন্দদায়ক নয়। তিনি বলেছেন, দোজখের দেয়ালে নাকি একটি ছিদ্র আছে। আর ঐ ছিদ্র বন্ধ করার জন্যই তিনি তোমাকে সৃজন করেছেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর কথা শেষ হওয়া মাত্রই লোকটি উচ্ছ্বসিত আনন্দে লাফিয়ে উঠতে চাইল। অন্তরে বয়ে চলল খুশির ঝড়। তার ভাব দেখে মনে হলো, সে যেন এমন একটি শুভ সংবাদ শুনার জন্যই যুগ যুগ অপেক্ষা করে আসছে। সে দু'ফোটা আনন্দাশ্রু চোখ টিপে ফেলে দিয়ে বলল, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আজ পরমভাবে পুলকিত এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আমাকেও তিনি একটি কাজে ব্যবহার করবেন। আমার জন্য এর চেয়ে খুশির কথা আর কি হতে পারে যে, সকল বাদশাহের বাদশাহ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা আমার মতো একজন নাখান্দাকেও একটি কাজের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। যাক আমার জীবন তাহলে সার্থক।

লোকটির কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত খুশি হলেন। খুশি হলেন হযরত মূসা (আ.)ও। তাইতো তার এ কৃতজ্ঞতার উত্তম প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে তাকে পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন। তার হাত-পা ঠিক হয়ে গেল। চেহারার উজ্জ্বলতা ফিরে এল। ক্ষণিকের মধ্যে পরিণত হলো প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট সুন্দর সুদর্শন এক যুবকে। সুবহানাল্লাহ!

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে হযরত মূসা (আ.) মহিলার কাছে এলেন। বললেন, মা! আল্লাহ পাক আপনাকে বর্তমান অবস্থায় থেকেই তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে বলেছেন। এতেই নাকি আপনার বেদনাদায়ক জীবনের অবসান ঘটবে। ফিরে আসবে সুখের জীবন। কোনো অভাবই থাকবে না আপনার। একথা শুনামাত্র মহিলা মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে চট্ করে বলে উঠল, এটা আল্লাহ কি বললেন! এটা কি কোন কথা হলো? এত কষ্ট করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব কেন? তিনি আমাকে এমন কি নিয়ামত দিয়েছেন, যার জন্য আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পারি? যান, আপনার কথা আমি আর শুনতে চাই না। দয়া করে আপনি যেতে পারেন।

মহিলার মুখ থেকে এ দৃষ্টতাপূর্ণ কথাগুলো শুনে হযরত মূসা (আ.) মনে খুব কষ্ট পেলেন। মনে মনে বললেন, কেন? আল্লাহ তা'আলা কি তাকে বসবাসের জন্য ছোট্ট হলেও একটি কুঁড়ে ঘর দেননি। তাকে দেখার জন্য চোখ, চলার জন্য পা, ধরার জন্য হস্তদ্বয় দেননি? সে কি নিয়মিত ঠাণ্ডা পানি পান করে না? স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করতে পারে না? তাকে কি তিনি বাকশক্তি দান করেননি? এগুলো কি আল্লাহর নেয়ামত নয়? তবে কেন এই ধৃষ্টতা? কেন এই উদ্ধতপূর্ণ আচরণ?

কথাগুলো তিনি তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন। সাথে সাথে তিনি মহিলার পরিণতির কথা ভেবে উদ্বিগ্নও হচ্ছিলেন। তাঁর ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তার রেখা।

নবীর চিন্তা এখনো শেষ হয়নি। ঠিক এমন সময় একটি দমকা হাওয়া এসে মহিলার কুঁড়ে ঘরটি উড়িয়ে নিয়ে গেল। নাশুকরীর শাস্তি সে ভোগ করল কড়ায় গণ্ডায়। এবার তার বুঝে এল। আফসোস করে বলল, হায়! আমি যদি কৃতজ্ঞ হতাম; তাহলে আমাকে শেষ সম্বলটুকুও হারাতে হতো না।

মহিলার কাছ থেকে চলে এসে হযরত মূসা (আঃ) প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ ধনী লোকটির কাছে এসে বললেন, আল্লাহ পাক তোমাকে যে ধন-সম্পদের নিয়ামত দিয়েছেন তুমি যদি এর নাশুকরী কর তবেই তোমার সম্পদ কমে যাবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর মুখ থেকে নাশুকরী তথা অকৃতজ্ঞতার কথা শুনা মাত্র সে আৎকে উঠে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল, এ তো কিছুতেই হতে পারে না। যে খোদা আমাকে এত ধন-সম্পদের অধিকারী করেছেন, যাঁর অপরিসীম দয়ায় এত বেশি ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছি, কি করে আমি তাঁর নাশুকরী করব? কি করে আমি তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হব!! এ যে আমার কল্পনারও অতীত। এ কথা বলার পর তার সম্পদ আরো বেড়ে গেল।

সম্মানিত পাঠক! আলোচ্য ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয়টি দিবসের আলোর মতোই স্পষ্ট। আসলে চিন্তা করলে দেখা যাবে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি পদে পদে আমরা আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ভোগ

করছি। তাঁর নিয়ামত ছাড়া ক্ষণকাল বেঁচে থাকাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে নিজেই ঘোষণা করেছেন- তোমরা যদি আমার নিয়ামতসমূহকে গণনা করতে থাক, তবে কখনোই তা গুনে শেষ করতে পারবে না।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, তোমরা যদি আমার নিয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি তোমাদের নিয়ামতকে আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি নাশুকরী কর, তবে আমি নিয়ামত ছিনিয়ে নিব। আর মনে রেখো আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামত যেমন- ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, আলো-বাতাস, আগুন-পানি, চোখ-নাক, হাত-পা ইত্যাদির শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দিন এবং সাথে সাথে এসব নিয়ামতকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করারও তৌফিক নসিব করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন॥

স্মরণীয় বাণী

অনেকেই জীবিকা অর্জনের প্রতিযোগিতায় নিজেকে লাঞ্ছিত করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু যেদিন আল্লাহর এ কালামের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো– "দুনিয়াতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আমি আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করি নি।" – সেদিন থেকে জীবিকার চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আমার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, নিষ্ঠার সাথে তা পালন করতে তৎপর হয়েছি। মনের মধ্যে এমন একটা আস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি আমার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করলে তিনিও আমার প্রতি তার দায়িত্ব ঠিক মতোই আদায় করবেন।

– হযরত হাতেম আল আসাম্ম (রাহঃ)

১২

ওলীদের সাথে বেয়াদবির মাশুল

ইমাম জাফর সাদিক (র.) ছিলেন একজন বিখ্যাত বুজুর্গ। আল্লাহর ওলী। তার মান-মর্যাদা, শিক্ষা-দীক্ষা ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা যতই বেশি বলা হোক না কেন, তা হবে খুবই কম, অকিঞ্চিৎকর। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর যেমন অপূর্ব দক্ষতা ছিল, মা'রেফাতের লাইনেও তিনি ছিলেন সমকালীন বুজুর্গদের সেরা।

তাঁর আমলে মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন মনসুর বিল্লাহ। হিজরি চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে তিনি খিলাফতের আসন অলঙ্কৃত করেন। খিলাফতের মসনদে বসে তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন- ইমাম জাফর সাদিক (র.) কে লোকজন শ্রদ্ধা করে, প্রাণভরে ভালবাসে। তাদের উপর তাঁর রয়েছে সীমাহীন প্রভাব। তিনি যা বলেন, লোকজন অপরিসীম উৎসাহের সাথে তাই পালন করে।

জাফর সাদেক (র.)-এর এ অবস্থা খলিফাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলে। তার কপালে গভীর চিন্তার রেখা। চোখ দু'টোতে কেমন জ্বালাময় চাহনি। মনের সার্বক্ষণিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয় তার মুখোভাবে। তিনি একাকী নির্জনে বসে ভাবেন, না জানি, জাফর সাদিক খিলাফতের দাবি করে বসেন কিংবা তাঁর ভক্তরা আমার স্থলে তাঁকেই খলিফা হওয়ার দাবি করে। মোট কথা, ইমাম জাফর সাদিকের বিরাট ব্যক্তিত্ব, জনগণের উপর বিস্তর প্রভাব ও তাঁর প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালবাসাকে খলিফা নিজের জন্য অকল্যাণকর মনে করলেন। সুতরাং পূর্ব থেকেই সাবধান না হলে ভবিষ্যতে যে কোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

এসব ভাবতে ভাবতে খলিফা তার উজিরকে ডেকে বললেন, মন্ত্রী মহোদয়! জাফর সাদিককে বন্দী করে আমার দরবারে হাজির কর। আমি নিজ হাতে তাকে হত্যা করব।

চমকে উঠলেন মন্ত্রীবর। একি কথা! সম্পূর্ণ নিরীহ নির্দোষ আত্মভোলা একজন মানুষ! পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস ও লোভ-লালসা পরিহার করে যিনি অবিরাম আল্লাহর ইবাদতে বিভোর, খলিফা কেন সেই আত্মভোলা মহান তাপসকে হত্যা করতে চান?

বাদশাহের নির্দেশ শুনে উজির সবিনয়ে বললেন, বাদশাহ নামদার! বেচারা পার্থিব সবকিছু বিসর্জন দিয়ে একাকী শুধু ইবাদত-বন্দেগি ও জিকির-আযকার করে দিনাতিপাত করছেন। তাঁকে হত্যা করার কি প্রয়োজন, বুঝতে পারলাম না। আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি এ থেকে বিরত থাকুন। আমি মনে করি, তাঁকে হত্যা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! খলিফা তার সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি উজিরকে শাসিয়ে বললেন, উজির! আমার নির্দেশ পালন করা তোমার কাজ। কাকে হত্যা করতে হবে, আর কাকে পুরস্কার দিতে হবে, তা তোমার চেয়ে আমিই ভাল জানি। সুতরাং অনতিবিলম্বে আদেশ পালন কর।

অগত্যা মন্ত্রীবর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইমাম জাফর সাদেককে ধরে আনার জন্য চললেন।

এদিকে বাদশাহ স্বীয় নওকরকে বলে রাখলেন, জাফর সাদিক যখন আমার দরবারে হাজির হবে তখন তুমি আমার দিকে লক্ষ্য রেখো। আমি যখন আমার টুপি উঠিয়ে রাখব তখনই তুমি তরবারির এক আঘাতে তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে।

কিন্তু আল্লাহর মহিমা বুঝা ভার। যখন হযরত জাফর সাদিক (র.) বাদশাহের দরবারে তাশরীফ আনলেন, তখন তার চেহারায় স্বর্গীয় জ্যোতি খেলা করছিল। সে জ্যোতির উজ্জ্বলতা যেন চন্দ্রালোককেও হার মানায়। বাদশাহ সেদিকে দৃষ্টিপাত করতেই সম্মুখে ভূত দেখার মতো চমকে

উঠেন। ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠে তার হৃদপিণ্ড। বিবর্ণ হয়ে উঠে মুখমণ্ডল। দু'চোখে ফুটে উঠে ভয়ার্ত ভাব।

এ অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির জন্য বাদশাহ মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কিছুতেই ভেবে পান না- কি করতে চেয়েছিলেন, আর কি হতে যাচ্ছে।

বাদশাহ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। তারপর হযরত জাফর সাদিককে আন্তরিক মোবারকবাদ ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়ে আপন সিংহাসনে এনে বসালেন। শুধু তাই নয়, মহা তাপসের পায়ের তলায় বসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বিনয়ের সাথে বললেন, হযরত! কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি? আপনার যে কোনো খেদমতের জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত।

জাফর সাদিক (র.) শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন। বললেন, আপনার কাছে আমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে একটি কথা হলো, ভবিষ্যতে এভাবে আমাকে দরবারে ডেকে আমার ইবাদত-বন্দেগিতে বিঘ্ন ঘটাবেন না।

বাদশাহ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, আর কখনও আপনাকে ডেকে ক্ষতি করব না। অতঃপর তিনি তাঁকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

হযরত জাফর সাদিত (র.) যেমন এসেছিলেন, তেমনি বিদায় নিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে কিছুই করতে দেখা গেল না; কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রচণ্ড প্রভাব তখনও শেষ হয়নি। তিনি বিদায় গ্রহণের পরক্ষণেই বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলেন। তার এ বেহুঁশী এত দীর্ঘ সময় ছিল যে, পর পর তিন ওয়াক্ত নামাজ তার কাযা হয়ে গেল।

বাদশাহের এ অবস্থা দেখে, উজির-নাজির, পুত্র-কন্যা, পাত্র-মিত্র সকলেই হতভম্ব হয়ে গেল। কোথা হতে কি হয়ে গেল, কেউ বুঝতে পারল না। জ্ঞান ফিরার পর সকলেই বাদশাহকে জেঁকে ধরলেন। বললেন, জাহাঁপানা! কি হয়েছিল আপনার? আপনি বেহুঁশ হয়েছিলেন কেন?

বাদশাহ তখন অস্ফুট স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, শুন! যখন জাফর সাদিক (র.) দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন আমি দেখলাম, তিনটি

বিষধর সাপ ফণা উচুঁ করে দ্রুত গতিতে আমার দিকে ধেয়ে আসছে। সাপগুলো কাছে এসে আমাকে বলল, দেখ মনসূর! জাফর সাদিকের কোন অনিষ্টের চিন্তা করলে আমরা তোমাকে দংশন করব। যার ফলে অশেষ দুর্ভোগের পর তোমার নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং নিজের কল্যাণ চাইলে তাকে এক্ষুণি ইজ্জতের সাথে বিদায় কর।

সাপের ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও তার কথা শুনে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড ভয়-ভীতি আমাকে ঘিরে ধরে। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি জাফর সাদেককে হত্যার চিন্তা বাদ দিয়ে তাঁর সাথে সদাচরণ শুরু করি। যা তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছ। কিন্তু মনের ভয় তখনও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়নি। তাই তিনি চলে যাওয়ার পর পরই আমি মূর্ছা যাই। বেহুঁশ হয়ে লুটিয়ে পড়ি।

প্রিয় পাঠক! সত্যি যারা আল্লাহর পথের পথিক, তাঁর ধ্যানে যারা সদা মগ্ন, পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁদের এতটুকু অনিষ্ট করতে পারে না। অপরিমেয় খোদায়ী শক্তি তাদেরকে সর্বদা রক্ষা করে চলে।

হাদীসে কুদসীতে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক বলেছেন যারা আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করল, বিদ্বেষ পোষণ করল, তাদের সাথে আমি আল্লাহ স্বয়ং যুদ্ধ করার ঘোষণা দেই। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে উলামা-মাশায়েখ ও হাক্কানী বুজুর্গদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন এবং মনের মধ্যে তাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা স্থান দেওয়ার তৌফিক নসিব করুন। আমীন॥*

* সূত্র : তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১১।

www.smfoundationbd.com

১৩

একটি মধুময় স্বপ্ন ও তার বাস্তবায়ন

হযরত বিশ্‌রে হাফী (র.) ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম। ইলমে শরীয়তের আলিম হিসেবেও তিনি ছিলেন অতি উচ্চাসনের অধিকারী। কিন্তু এ মহান ব্যক্তির জীবনের শুরু অংশটি খুব ভাল ছিল না। তিনি মদ পান করতেন। এ ছিল তাঁর প্রতি- দিনের নেশা। মদ ছাড়া একটি দিন অতিবাহিত করা তাঁর জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

এক সময়ের ঘটনা। একদিন তিনি পথ চলছিলেন। মাতাল অবস্থা। একটু পূর্বে এক বোতল সাবাড় করে এসেছেন। চলতে চলতে হঠাৎ পথে একটি কাগজের টুকরো দেখতে পেলেন। তাতে আরবিতে লেখা ছিল, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"। তিনি কাগজটি অত্যন্ত ভক্তিভরে তুলে নিলেন। তারপর তাকে পরম শ্রদ্ধার সাথে ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে আতর গোলাপ মেখে ঘরের একটি উঁচু স্থানে যত্নের সাথে রেখে দিলেন।

তাঁর এ কাজে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি ঐ রাতে ঐ এলাকার একজন দরবেশকে স্বপ্নে দেখালেন। দরবেশ দেখলেন, আল্লাহ পাক তাকে বলছেন- ওহে দরবেশ! তুমি গিয়ে বিশ্‌রে হাফীকে বল, সে যেমন আমার নামকে তাজীম করে শ্রদ্ধাভরে উঁচু স্থানে রেখে দিয়েছে, আমিও তেমনি পুণ্যের খুশবু দ্বারা তার হৃদয়কে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে তার ইজ্জত সম্মান ও মর্যাদা বুলন্দ করে দিব।

দরবেশ স্বপ্ন দেখে ভাবলেন, বিশ্‌রে হাফী তো খারাপ লোক। মদ ছাড়া একদিনও তার চলে না। সুতরাং তার মতো অসৎ ব্যক্তির পক্ষে

এরূপ সৌভাগ্য লাভ করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। আমি হয়তো অলীক স্বপ্ন দেখেছি, যা সত্য নয়।

এরূপ চিন্তা-ভাবনার পরও তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়ে আবার বিছানায় নিদ্রাভিভূত হলেন। এবার চোখে ঘুম আসতে না আসতেই আবারও তিনি সেই একই স্বপ্ন দেখলেন। এভাবে পর পর তিনবার একই স্বপ্ন দর্শন করে তিনি তাঁর স্বপ্নের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন।

সকালে ফজরের নামাজ আদায়ের পর উক্ত দরবেশ বিশ্‌রে হাফী (র.) এর বাড়িতে গেলেন। তিনি বাড়ির লোকজনকে বিশ্‌রে হাফী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তারা বলল, তিনি এখন ঘরে নেই। হয়তো অমুক শরাব খানায় অত্যধিক মদ পান করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন।

দরবেশ দ্রুত সেখানে পৌঁছলেন। একজন লোককে ডেকে বললেন, ভাই! আমি বিশ্‌রে হাফীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। তুমি তাকে বল, আমি তাকে একটি শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

ইতিমধ্যে বিশ্‌রে হাফী (র.)-এর চেতনা ফিরে এসছিলো। লোকটির কথায় বিশ্‌রে হাফী (র.) দৌড়ে এসে বললেন, আপনি কার পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছেন?

দরবেশ বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি তোমার ব্যাপারে স্বপ্নযোগে আমাকে যে সুসংবাদ দিয়েছেন, সেই সুসংবাদই আমি জানাতে এসেছি।

এ কথা শুনে বিশ্‌রে হাফী (র.)-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, জনাব! তাড়াতাড়ি আপনার নিয়ে আসা সুসংবাদ আমাকে বলুন। আমার সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে সুসংবাদ পাঠিয়েছেন।

এবার দরবেশ বিশ্‌রে হাফী (র.)-কে আরো কাছে টেনে আনলেন। তারপর স্বপ্নের কথাগুলো তাকে শুনালেন। স্বপ্নের কথাগুলো শুনে বিশ্‌রে হাফী (র.)-এর হৃদয়ে এক মহাআন্দোলন শুরু হল। তার দু'চোখে নেমে এল কৃতজ্ঞতার অশ্রু। তিনি সাথে সাথে অন্যান্য মদ্যপ বন্ধুদের বিদায় বাণী শুনিয়ে বললেন- বন্ধুগণ! এই আমি চললাম। তোমরা

আর কখনো এ জঘন্য কাজে আমাকে শরিক হতে দেখবে না। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে এলেন এবং খাঁটি দিলে তওবা করে লোকালয় থেকে বহু দূরে নির্জনে চলে গিয়ে গভীর ইবাদতে মগ্ন হলেন। আল্লাহর ভয়ে তিনি এতো বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, জুতা পরিধান করা পর্যন্ত পরিত্যাগ করলেন। এরপর সারা জীবন কখনো তিনি আর জুতা পরিধান করেননি। এ জন্যই তিনি 'হাফী' তথা শূন্যপদ উপাধি লাভ করেছিলেন। লোকজন তাঁকে জুতা পরিধান না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যেদিন সর্বপ্রথম আমার মাশুক আল্লাহর সাথে এশক আর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে, সেদিন আমি খালি পায়ে ছিলাম। সুতরাং এখন জুতা ব্যবহার করতে আমার লজ্জাবোধ হয়।

মুহতারাম বন্ধুগণ! দেখলেন তো! আল্লাহর নাম সম্বলিত একটি কাগজের টুকরার সম্মান করার কারণে আল্লাহ পাক হযরত বিশ্‌রে হাফী (র.) কে কতবড় উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। মাতাল অবস্থা থেকে তুলে এনে আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমারও যদি আল্লাহ নামের সম্মান করি, বেশি বেশি করে এ নামের জিকির করে জিহ্বাকে তরতাজা রাখি, প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি পদে পদে তাঁর স্মরণ ও ভয় জাগ্রত রাখি তবে অবশ্যই আমাদের জীবনও সুন্দর সুখময় ও সম্মানজনক হবে। অবশ্যই তিনি আমাদের যাবতীয় পাপরাশি ক্ষমা করে দিয়ে আপন কোলে স্থান দিবেন। গ্রহণ করবেন-অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে। হে আল্লাহ! তুমি তোমার অশেষ করুণায় এ বইয়ের পাঠক-পাঠিকা ও লেখকসহ সকল মুসলমান ভাই-বোনকে তোমার জিকিরে তরুতাজা থাকে এমন জিহ্বা নসিব কর। দান কর- এমন এক হৃদয়, যাতে কেবল তোমারই নাম, তোমারই উপস্থিতি ও তোমারই ভালবাসা স্থান পাবে। ইয়া আরহামার রাহিমীন! তুমি আমাদের সকলকে তোমার দীনের একনিষ্ঠ খাদিম হিসেবে কবুল কর। আমীন॥*

* সূত্র : তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১

www.smfoundationbd.com

১৪

হাদীস শুনার নযীরবিহীন আগ্রহ

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী। সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তাঁর অবস্থা স্বচ্ছল হলেও এক সময় তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। তিনি ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে মসজিদে নববীর মিম্বর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরার মধ্যভাগে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতেন। লোকজন পাগল মনে করে তার ঘারের উপর পা রাখত। অথচ তিনি পাগল ছিলেন না। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়েই তাঁর এ দুরবস্থা হতো। নিম্নে উক্ত মহান সাহাবীরই ছোট্ট একটা ঘটনা তুলে ধরা হলো।

মানুষ চলাচলের একটি সরু পথ। মদীনার বস্তিগুলোর আশপাশ দিয়ে দূরে, বহুদূরে মরুর বুকে গিয়ে মিলেছে। এ পথে চলাচল করেন সাহাবগণ। চলেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তা ছাড়া মুজাহিদদের কাফেলা এ পথেই ধূলিঝড় উড়িয়ে ছুটে যায় জিহাদের ময়দানে।

রাত ভোর হলো। গাছে গাছে পাখিরা ডানা ঝাপটে জেগে উঠল। পথে পথে লোক চলাচল এখনো এতটা শুরু হয়নি।

জনশূন্য এ পথের পাশে এসে দাঁড়ালেন হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)। শীর্ণ দেহ, বিবর্ণ চেহারা, কোঠরাগত চক্ষু। ক্ষুধার জ্বালায় ভীষণ

অতিষ্ঠ; ঠোঁট দু'টি শুকিয়ে কুঁচকে গেছে। দাঁড়িয়ে তিনি এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, ইতি-উতি করছেন। অপেক্ষা করছেন কারো। কিন্তু শূন্য পথে কাউকে দেখছেন না। তীব্র ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে মাঝে মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন।

কিছুক্ষণ পর এক মানব মূর্তি এগিয়ে এল। ধীর গতি, প্রশস্ত ললাট, দীপ্তময় চেহারা। লোকটি আর কেউ নন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গারে সওরের একান্ত সাথী, সবচেয়ে মর্যাদাবান সাহাবী হযরত আবূ বকর (রা.)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) তাঁকে আসতে দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেলেন। ক্ষুধার কথা কি করে মুখ ফুটে বলবেন, এই হলো সমস্যা। ফলে মুহূর্তে তাঁর মনোবল উবে গেল। লজ্জা আর জড়তা এসে ভিড় করে অচল করে দিল তাঁর বাকশক্তিকে।

ইতিমধ্যে আরো নিকটে চলে এলেন আবু বকর (রা.)। তিনি যতই নিকটে আসছিলেন, আবু হুরাইরা (রা.) এর জড়তা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ভাবলেন, একটা কিছু জিজ্ঞেস করি। এতে কথার তালে তালে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছা যাবে। তারপর কি আর তিনি না খাইয়ে ছাড়বেন?

আবূ বকর (রা.) আরো নিকটে এলেন। আবূ হুরাইরা (রা.) লজ্জায় ক্ষুধার কথা বলতে পারলেন না। তিনি শুষ্ক কণ্ঠে কিছু একটা জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু আবূ বকর (রা.) ছিলেন অন্যমনস্ক। ফলে দ্রুত প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলে গেলেন। আর আবূ হুরাইরা (রা.) হতভম্ব হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন পূর্বের মতোই।

সময়ের তালে তালে ক্ষুধার জ্বালা আরো তীব্রতর হতে লাগল। চারদিক ঝাপসা লাগছে। তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়তো কেউ আসবে এই আশায়।

কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রা.) এলেন। তেজোদীপ্ত গতি ও দৃঢ় পদক্ষেপ। হয়তো জরুরি কোনো কাজে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে আবূ হুরাইরা (রা.)-এর মনে আবার সেই লজ্জা এসে ভিড় জমাল। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল মুখ খুলে কিছু বলতে। কি করবেন, কি বলবেন কিছুই বুঝে

www.smfoundationbd.com

উঠতে পারছিলেন না তিনি। অবশেষে ওমর (রা.) একদম নিকটে এলে তিনি তাঁর সাথে সাহস করে এমনভাবে কথা বলা শুরু করলেন, যেন তাঁকে সঙ্গে করে তিনি বাড়ি নিয়ে যান এবং খাবারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এবারও তাঁর আশা পূর্ণ হলো না। ওমর (রা.) কথা শেষ করে চলে গেলেন। সুতরাং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আবূ হুরাইরা (রা.) পথেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

হতাশার হাহাকার নিষ্ফল পদক্ষেপ আর ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণায় আবু হুরাইরা (রা.)-এর অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। কিন্তু তবু আশার ক্ষীণ আলোক রশ্মিতে ভরসা করে পথেই দাঁড়িয়ে রইলেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন, এবার কেউ এলে মনের কথা মুখ ফুটে বলতে দ্বিধা করবেন না।

খানিক পর। একই পথ ধরে এগিয়ে এলেন আরেকজন মানব মূর্তি। উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমণ্ডল, অন্তর্ভেদী চাহনী, ঈষৎ উন্নত নাসিকা, পুষ্পিত শতদলের স্নিগ্ধ পরাগের নিটোল হাসি তাঁর ওষ্ঠাধরে। তিনি আরো কাছে এগিয়ে এলেন। আবূ হুরাইরা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মধুর হাসলেন। অন্তর্ভেদী চক্ষু দিয়ে সবকিছু দেখলেন। হৃদয় দিয়ে তার হৃদয়ের কথা বুঝলেন। বললেন, আবূ হুরাইরা! এস আমার সাথে।

আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। আমি তাঁর পিছু পিছু হাটতে লাগলাম। মসজিদে নববীর পাশে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ছোট ছোট কুটিরগুলোর নিকট পৌঁছলাম। অন্দরে প্রবেশ করলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাকেও আসতে বললেন। গিয়ে দেখি রাসূলের সামনে ছোট একটি পেয়ালা। দুধে ভর্তি। ভাবলাম, হয়তো এ টুকুই আমার ভাগ্যে লিখিত আছে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আবু হুরাইরা! যাও, মসজিদ থেকে আহলে সুফফার সকলকে ডেকে নিয়ে এস।

মসজিদে নববীতে আবু হুরাইরা (রা.)-এর মতো আরো অনেক সাহাবী থাকতেন। তাদের কোনো বাড়ি ঘর ছিল না। এদের সংখ্যা সময় ভেদে কম- বেশী হতো। এদেরকেই আহলে সুফফা বলা হতো।

ঘটনার দিন আহলে সুফ্‌ফার সদস্য ছিলেন মোট সত্তরজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ শুনে আবূ হুরাইরা (রা.) অস্থির হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, একে তো প্রচণ্ড ক্ষুধা। তার উপর মাত্র এক পেয়ালা দুধ। পেট ভরে পান করতে চাইলে তো আমারই হবে না। সেই দুধ পান করবে সত্তর জন! আমার ভাগ্যে তো তাহলে এক ফোঁটাও জুটবে না।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ। না মেনে উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়ে সকলকে ডেকে আনলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবাইকে পান করাও। ভাবলাম, হায়রে কপাল! এত অপেক্ষার পরও বুঝি ক্ষুধার্তই থেকে যাব। দুধ দেখে একটু পূর্বে যে আশার আলো ফুটে উঠছিল, সবাইকে পান করানোর নির্দেশে তাও নিভে গেল নিমিষে।

কিন্তু রাসূলের নির্দেশে পেয়ালাটি তুলে নিলাম। তারপর এক একজন করে প্রত্যেকের সামনে এগিয়ে দিলাম। প্রত্যেকে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করে আবার ভরা পেয়ালাটাই আমাকে ফিরিয়ে দিল। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আমি নির্বাক-বিস্ময়ে স্তম্ভিত। এক পেয়ালা দুধে সত্তর জনের তৃপ্তি-এ যে কল্পনারও অতীত!

সবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি আমার হাত থেকে নিয়ে আমার দিকে নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন। মায়া-মমতা আর স্নেহভরা অপূর্ব সে দৃষ্টি। বললেন, আবূ হুরাইরা! এখন শুধু আমি আর তুমি বাকি। নাও, আগে তুমি পান কর।

রাসূলের নির্দেশ পেয়ে আমি দেরি করলাম না। চুমুকে চুমুকে দীর্ঘক্ষণ পান করলাম। কিন্তু দুধ শেষ হলো না।

আমি পেয়ালা থেকে মুখ তুললাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরো পান কর। আমি আরো পান করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো বললেন, আরো পান কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যথেষ্ট পান করেছি, অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়েছি। আর পারছি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন। বড়

www.smfoundationbd.com

মধুময় সেই হাসি। এবার পেয়ালাটি তিনি নিজ হাতে তুলে নিলেন এবং নিঃশেষ করে ফেললেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! আলোচ্য ঘটনায় একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তা হলো, হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এর হাদীস প্রেম। কেননা, তিনি ইচ্ছে করলে আয়-রোজগারের জন্য কোনো পেশা অবলম্বন করতে পারতেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তিনি তা করেননি। এর কারণ হলো, তিনি মনে মনে সর্বদা এ ভয় করতেন যদি আমি চলে যাই, তাহলে হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কথা, মুখ নিসৃত কোনো বাণী আমার ছুটে যাবে। এ জন্যেই তিনি খেয়ে না খেয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পড়ে থাকতেন।

ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায়, হযরত সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ কখনো কখনো মাত্র একখানা হাদীস সংগ্রহের জন্য শত শত মাইল সফর করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই হাদীসগুলো কিতাব আকারে আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা তা পড়ারও সময় পাই না। সফরতো অনেক দূরের কথা। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হাদীসের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করত তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আমীন॥*

স্মরণীয় বাণী

তোমাকে আল্লাহ তাআলা বিপদ-আপদের মাধ্যমে সতর্ক করলেও নাখোশ হয়ো না। কেননা যাকে তিনি ভালবাসেন তাকেই তিনি সতর্ক করে থাকেন।

– হযরত সুলাইমান (আ:)

* সূত্র : হেকায়েতে সাহাবা, পৃষ্ঠা ৫৯৪

www.smfoundationbd.com

১৫

মজবুত ঈমানের অনুপম উদাহরণ

সে বহুকাল পূর্বের কথা।

মুসলিম মুজাহিদ আর রোমীয়দের মাঝে যুদ্ধ বাঁধত প্রায়ই। সে সব যুদ্ধে মুসলমানগণ তাদের শৌর্য-বীর্য ও ঈমানী চেতনার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। তারা বুঝিয়ে দিতেন-আমাদের যুদ্ধ কেবল ন্যায়ের জন্য, ইসলামের জন্য, ইসলামের শান-শওকত বৃদ্ধির জন্য, বীরত্ব প্রদর্শন কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়।

একদা মুসলমানদের সাথে রোমীয়দের তুমুল লড়াই শুরু হলো। উভয় পক্ষই বীর বিক্রমে যুদ্ধ করল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল মুসলমানদের একই পরিবারের তিন ভাই রোমীয়দের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন।

তিন ভাইয়ের প্রত্যেকেই ছিলেন বীর-বাহাদুর, অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। প্রায় যুদ্ধেই তারা জয়লাভ করতেন। সুতরাং এদেরকে বন্দী হিসেবে পেয়ে রোমীয়রা দারুণ খুশি, আনন্দে আটখানা।

বন্দী তিন ভাইকে রোম সম্রাটের নিকট উপস্থিত করা হলো। সম্রাট তাদেরকে দেখে একটা অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল, তোমরা এবার আমার হাতে বন্দী। মৃত্যুই তোমাদের একমাত্র শাস্তি। তবে তার আগে আমার প্রস্তাব হলো, যদি তোমরা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ কর, তবে তোমরা যে নিঃশর্ত ক্ষমা পাবে তা-ই নয়, আমার অর্ধেক রাজত্বও পাবে।

বাদশাহের এ লোভনীয় প্রস্তাব তারা অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, হে সম্রাট! তুমি মনে করেছ, আমরা সম্পদের লোভে তোমার পাতা ফাঁদে পা দিব? মনে রেখো তোমার এ আশা আশাই থেকে যাবে। কখনোই পূরণ হবে না।

বন্দীদের মুখ থেকে এরূপ কথা শুনতে হবে, অহঙ্কারী সম্রাট কখনোই তা ভাবতে পারেনি। সে অস্থির হয়ে কক্ষময় পায়চারী করতে করতে অস্ফুট স্বরে বলল, এত বড় সাহস! এত বেশি স্পর্ধা তোমাদের? তোমরা হয়তো জান না যে, কোন সিংহের খাঁচায় তোমরা বন্দী হয়েছ।

বন্দীদের কথায় সম্রাটের রাগ চরমে উঠে। তার চোখ দু'টো জ্বলে উঠে ক্রুদ্ধ সিংহের মতো। উষ্ণ হয়ে উঠে ধমনির রক্ত। অবশেষে সে দাঁত কড়মড় করে অনুগত চাকরদের নির্মম নির্দেশ দিয়ে বলে, এসব খবিশদের উচিত শিক্ষার জন্য তিনটি বিশাল ডেগে তৈল ভর্তি করে গরম করতে থাক।

চাকররা কাজে লেগে গেল। তারা বৃহৎ তিনটি ডেগে তৈল ঢেলে একাধারে তিনদিন পর্যন্ত জ্বাল দিল। ফলে তৈলগুলো উত্তপ্ত হয়ে টগবগ করে ফুটতে লাগল। বাদশাহ প্রতিদিন উত্তপ্ত সেই ডেগের কাছে মুজাহিদদেরকে ডেকে নিয়ে ভয় দেখিয়ে বলে- তোমরা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ কর। অন্যথায় এই তৈলে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুরভাবে তোমাদের হত্যা করব।

মুজাহিদরা এবারও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বাদশাহ! আমাদের কেবল অযথাই ভয় দেখাচ্ছে। স্মরণ রেখো, আর যাই হোক না কেন, কখনোই আমরা শান্তির ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করব না। আমাদের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভয়ে ভীত নই।

চতুর্থ দিনে এই হৃদয়হীন সম্রাট বড় ও মেঝো ভাইকে এই ফুটন্ত তৈলে নিক্ষেপ করল। একটু দয়া-মায়াও হলো না এই পাষাণ নর-পিশাচের। বরং দুই মুজাহিদকে নির্মমভাবে শহীদ হতে দেখে তার ভয়ঙ্কর মুখে ফুটে উঠে একটা বিদঘুটে কুৎসিত হাসি।

অতঃপর ছোট ভাইকে লক্ষ্য করে বলল, দেখলে তো তাদের করুণ পরিণতি! দেখলে তো কিভাবে তৈলে পড়ার সাথে সাথে তাদের গোশতগুলো হাড্ডি থেকে পৃথক হয়ে গেল। আমি জানি, জীবনকে সবাই ভালবাসে। সুতরাং জীবনের মায়া থাকলে এখনই আমার প্রস্তাব কবুল কর। বল, আমি খৃস্ট ধর্ম ভালবাসি।

ছোট ভাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বলল, বাদশাহ মহোদয়! আপনি একে আমার সোপর্দ করে দিন। আমি একমাসের মধ্যে একে খৃস্টান বানিয়ে আপনার দরবারে হাজির করব। বাদশাহ বলল, কিভাবে একে খ্রিস্টান বানাবে? বৃদ্ধ বলল, সে কৌশল আমার জানা আছে। আমার বিশ্বাস আমার কৌশল অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। কৌশলটি হলো, মানুষ সাধারণত নারীর প্রতি দুর্বল থাকে। বিশেষ করে সে নারী যদি সুন্দরী রূপসী হয়, তবে তো কোনো কথাই নেই। এর জন্য সে সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

মহামান্য সম্রাট! আমার এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা আছে। সত্যি কথা বলতে কি, এমন নিখুঁত সুন্দরী পৃথিবীতে বিরল। শুধু তাই নয়, তার কোকিল কণ্ঠি গলা ও দরদ ভরা সুর কঠিন হৃদয়ের মানুষকেও মোমের মতো গলিয়ে ফেলে। তাছাড়া তার বুদ্ধিমত্তা ও অপরকে কৌশলে ধর্মান্তর করার বিরল প্রতিভা তো আছেই। বাদশাহ ভাবল, বুড়ো ঠিক কথাই বলেছে। তাই মুজাহিদকে সে বুড়োর নিকট সোপর্দ করল।

বুড়ো বন্দী মুজাহিদকে বাড়ি নিয়ে গেল। অতঃপর রক্তিম চন্দ্রিমার ন্যায় উজ্বল চেহারা বিশিষ্ট ষোড়শী কন্যাকে ডেকে এনে বলল, এই নাও মা। ছেলেটি মুসলমান। যেভাবেই হোক তাকে খ্রিস্টান বানাবে।

মেয়ে বলল, আব্বু আপনি চিন্তা করবেন না। অনায়েসেই আমি তাকে আমাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারব। আমার সবকিছু জানা আছে। যে কোনো উপায়ে আমি আপনার আশা পূরণ করবই। এ বলে মেয়েটি বন্দী মুজাহিদকে নিজের সঙ্গে একই কক্ষে রাখতে লাগল, আর বাধ্য হয়ে মুজাহিদ সাহাবীও যৌবন প্লাবনে কানায় কানায় পূর্ণ এক অনিন্দ্য সুন্দরীর সাথে থাকতে লাগলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য! যে মেয়ের রূপ সৌন্দর্য ভুবন মোহনী, যার দৈহিক অবয়ব যে কোনো পুরুষকেই পাগল করতে সক্ষম, যার অপূর্ব ভাব-ভঙ্গি ও রূপ- জৌলুস মরা পুরুষকেও নতুন জীবন দান করে, সেই মেয়ের সঙ্গে মুজাহিদ আজ একই বিছানায় কতদিন ধরে থাকছেন, কিন্তু একবারও তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন না। একটি কথাও বললেন না। বরং তিনি দিনভর রোজা রাখেন, আর রাত্র হলে ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল হয়ে যান। এ অবস্থায় কেটে গেল দীর্ঘ এক মাস।

বৃদ্ধ লোকটি বাদশাহের কাছ থেকে চল্লিশ দিন সময় এনেছিল। তাই একমাস যাওয়ার পর সে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, মা! খবর কি? কতটুকু অগ্রসর হয়েছে। সময় কিন্তু আর বেশি নেই।

মেয়েটি বলল, বাবা! দুই ভাইয়ের করুণ মৃত্যুতে মুজাহিদ অত্যন্ত বিষণ্নতায় ভুগছে। কোনো বাহানায়ই সে আমার প্রতি আসক্ত হচ্ছে না। আপনি দয়া করে বাদশাহের কাছ থেকে আরো কিছুদিন সময় বাড়িয়ে আনুন এবং আমাদের জন্য মনোরম পরিবেশে একটি সুসজ্জিত কামরার ব্যবস্থা করুন। বৃদ্ধ পিতা তাই করল।

এবার মেয়েটি জানপ্রাণ দিয়ে তার চেষ্টা চালাল। সে কখনো তার যৌবন পুষ্ট দেহকে তার সামনে এলিয়ে ধরে বলে, হে মুজাহিদ! তুমি জানো না আমি কত দিন ধরে তৃষ্ণার্ত। আমি এত সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও তোমার সৌন্দর্যের মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আমার নিজের অস্তিত্ব তোমার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

মেয়েটি বারবার মুজাহিদকে কথার ছলনায় কাছে টানতে চায়। কখনো সে বলে-মুজাহিদ! আমার অপরূপ সৌন্দর্য ভরা যৌবন ঢলঢল চেহারার দিকে একটিবার তাকিয়ে দেখ। চেয়ে দেখো, আমি কত সুন্দর। তুমি কি জান না, ফুল ফুটে নীরবে যদি ঝরে যায়, কেউ যদি তার ঘ্রাণ গ্রহণ না করে, তবে সে ফুলের জীবনে সার্থকতা কি?

কিন্তু মুজাহিদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। তিনি একটি বারও মেয়েটির দিকে চোখ তুলে তাকালেন না। খোদার ভয় ও অবিচল ঈমান সর্বদাই তাঁকে এ অবৈধ কাজ থেকে বিরত রেখে চলেছে।

www.smfoundationbd.com

এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদও পূর্ণ হলো। মেয়েটির পক্ষে মুজাহিদকে ধর্মান্তর করা তো সম্ভব হলোই না, উপরন্ত তার অনুপম আদর্শে সে নিজেও মুগ্ধ হয়ে গেল। সে ভাবল, যে ধর্ম মানুষকে এতটা চরিত্রবান বানায়, যে ধর্মের লোকেরা ঈমানের মোকাবেলায় হাসি মুখে প্রাণ বিসর্জন দেয়, সেই ধর্ম থেকে বিমুখ থাকা চরম বোকামি বৈ কিছুই নয়।

তাই সে রজনীর শেষ ভাগে এসে মুজাহিদকে লক্ষ্য করে বলল, হে মুসলিম যুবক! আপনার অনুপম চরিত্র ও ঈর্ষণীয় ঈমানী শক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি যা করেছেন, যে পথে রয়েছেন, তা-ই সত্য। আমি আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলাম। চেয়েছিলাম, সৌন্দর্যের ফাঁদে ফেলে আপনাকে ধর্মান্তরিত করব। কিন্তু তা আর হলো কই! উল্টো আমার মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার ধর্মই চিরন্তন। আপনার ধর্মেই রয়েছে সফলতা। এ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে মুক্তি ও সফলতা নেই। এখন আমার ভুল ভেঙ্গেছে। অনুগ্রহ করে আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনার সত্য ধর্ম গ্রহণ করতে চাই। আশা করি আপনি আমকে দূরে ঠেলে দিবেন না।

মেয়েটির কথা শুনে মুজাহিদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অত:পর তাকে কালেমা পাঠ করিয়ে মুসলমান বানিয়ে নিলেন।

এবার মুজাহিদ মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা উভয়ে এখন মুসলমান। এখানে এক মুর্হূতের জন্য থাকাও আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। মেয়েটি বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। চলুন আমরা ঘোড়ায় আরোহণ করে এখান থেকে পালিয়ে যাই।

অতপরঃ মেয়েটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করল। তারা উভয়ে ঘোড়ায় চড়ে সে রাতেই অনেক পথ অতিক্রম করে নতুন এক এলাকায় গিয়ে হাজির হলো। এরপর থেকে রাতভর তারা পথ চলত ও দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকত। এভাবেই চলতে লাগল তাদের অগ্রযাত্রা।

এক রাতে তারা দুর্গম পথে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দু'জন অশ্বারোহী তাদের সামনে এসে পড়ল। প্রথমে তারা ভয়

পেল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই ভয় আনন্দে পরিণত হলো কেননা অশ্বারোহী দু'জন অন্য কেউ নন, তারই সেই শহীদ দুই ভাই।

যুবক বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ভাইগণ! আপনারা এখানে কোত্থেকে এলেন? আপনাদেরকে তো জালিম রোম সম্রাট আমার সামনেই নির্মমভাবে শহীদ করেছিল।

তারা বললেন, ভাই! বাহ্যিক দৃষ্টিতে তুমি ঠিকই দেখেছ। কিন্তু আমাদেরকে যখন উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করা হয় তখন আমরা আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম কুদরতে এক ডুব দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে চলে এলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আজ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন- তোমাদের বিবাহের আয়োজন করতে। এখন আমরা তোমাদের দু'জনকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করে দিব। তোমাদের বিবাহের অনুষ্ঠানকে সুন্দর সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যেই আমাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাত থেকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা তোমাদের বিবাহের কাজ সম্পন্ন করে আবার আপন স্থানে চলে যাব।

শহীদদের উপস্থিতিতে সেই তরুণীর সঙ্গে যুবকের বিবাহ সম্পন্ন হলো। বিবাহের পর শহীদগণ উভয়ের সুখময় জীবন কামনা করে চলে গেলেন। আর যুবক মুজাহিদ নববধূকে নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নিজ বাড়িতে চলে এলেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এরূপ অবিচল ঈমান ও উন্নত চরিত্র নসিব করুন। আমীন॥*

স্মরণীয় বাণী

যে ব্যক্তি আখনার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা না করে তার সামনে মারেফাতের দ্বার কখনোই উন্মুক্ত হয় না।

- হযরত হারেস আল মুহাসেবী (রাঃ)

* আলোচ্য ঘটনাটি আবু আলী জারীর (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) তাঁর 'ওয়ূনুল হিকায়াত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

প্রিয় ভাইয়া! সত্য বলতে কি! আপনার সিরিজের সবগুলো বই আমাকে বিমোহিত করেছে। আনন্দের ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছে আমার দেহে, মনের গভীরে। এ বইগুলো আমার হৃদয়ের পরশমনির অট্টালিকাকে গুড়িয়ে দিয়ে শান্তির হিমেল হাওয়া প্রবাহিত করেছে। সিরিজগুলো আমি এক দু'বার নয় অনেক বার পড়েছি, এখনও পড়ছি ভবিষ্যতেও পড়ে যাব ইনশাআল্লাহ। কেননা, আপনার সিরিজগুলোতে একদিকে যেমন সাহিত্যের ছড়াছড়ি আছে, তেমনি আছে ঈমানকে চাঙ্গা করার নানাবিধ উপকরণ। মোট কথা সিরিজগুলো যেন আমাকে যাদু করেই নিয়েছে। আমি যেখানেই যাই সেখানেই দু'একটা বই সাথে নিয়ে যাই। এক কথায় বলতে হয় যে, আপনার **'হৃদয় গলে'** সিরিজ আমার জীবনের একমাত্র সাথী। আমি মনে করি, বর্তমানে পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির চক্রজালে আটকে পড়া সমাজকে তাদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে ইসলামের সরল-সঠিক পথ দেখাতে আপনার 'হৃদয় গলে' সিরিজের বিকল্প নেই। ইতিমধ্যে সিরিজগুলো বাংলাদেশের প্রতিটি মহলে সত্যিকারের গল্প পড়ার এক জোয়ার সৃষ্টি করে দিয়েছে। পরিশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে, আপনি সমগ্র দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হৃদয়গ্রাহী একজন সফল কলম সৈনিক। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করবো 'হৃদয় গলে' সিরিজকে পরিপূর্ণ করে এরূপ আরো কিছু বই লিখে অশান্তির দাবানলে নিমজ্জিত সমাজকে শান্তির পথ দেখাবেন। সবশেষে ইতির খোঁচায় আপনাকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে জমানো সবটুকু ভালবাসার শুভেচ্ছা ও সালাম জানিয়ে আজ এখানেই.....। ধন্যবাদ।

মোঃ রিয়াজুল হক মজুমদার
সম্পাদক, দিশারী সাহিত্য কাফেলা
দারুল আরকাম আল- ইসলামীয়া, বি-বাড়ীয়া।

প্রিয় লেখক! আপনার হৃদয় গলে সিরিজ পড়ে অনেকেই লেখা পাঠায়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে ভাল লাগার কথাটি প্রকাশ করার চেষ্টা করে। আমিও তাদেরই একজন। তবে পার্থক্য হলো, আমি আমার ভাল লাগার অনুভূতিটুকু কবিতা আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অবশ্য আমি কোনো কবি নই। তবু ..... আশা করি আমার এ কবিতাটি আপনার খাদক বাক্সে না ফেলে যে কোন একটি সিরিজে ছেপে দিবেন।

পাঠকের মতামত চেয়েছেন আপনি
কিছু লিখে জানাতে বসলাম তখনি।
"হৃদয় গলে সিরিজ" পড়লাম যখনি
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরলো তখনি।
পড়লাম সিরিজগুলো একাগ্রচিত্তে
মনটা ভরে গেল আনন্দ খুশিতে।

সীমাহীন উপকৃত হয়েছি ভাই
ধন্যবাদ জানাতে হয় আপনাকে তাই।
দোয়াকরি মহান প্রভু আল্লারই কাছে
কবুল যেন করে নেন আপনার সিরিজটিকে
পরিশেষে, বলতে চাই এতটুকুন কথা
জাযা কাল্লাহু খাইরান লাকা॥

মুহাঃ তাজুল ইসলাম (নেত্রকোনা)
দ্বারে জাদীদ (২য় তলা)
হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৯. বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না। এ জন্য আমার ছোটকাল থেকে বই কিনা ও বই পড়ার অভ্যাস ছিল। এক কথায় বলতে গেলে, বই যেন আমার জীবন সাথী। হৃদয়ের স্পন্দন। চলার পাথেয়। তবে সত্য বলতে কি, সব বই কিন্তু আমার হৃদয়ে দাগ কাটেনি বা কাটতে পারেনি। তবে আপনার বইগুলোর ভিতরের অংশই কেবল নয়, শ্রুতিমুধুর নামগুলোও আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে। আপনার বইগুলো পড়ার সময় মনে হয়েছিল, আমি যেন এ জগতে নেই। চলে গেছি দূরে, বহুদূরে, অন্য এক জগতে। যদি বলি, আপনার বইগুলো আমার এবং আমার এক অতি পরিচিত মেয়ের জীবনের মোড় সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছে, তবে হয়তো মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না। আপনার বই পড়ে আমরা যেন এক নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। সত্য-সুন্দরের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমি যে মেয়ের কথা বলছি তার নাম সুমাইয়া আফরীন রিফাত। সে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী। আপনার বই থেকে কয়েকটি গল্প শুনার পর সে এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। পর্দা মতো চলে। টিভি দেখে না। শুধু তাই নয়, তাদের গোটা পরিবারের সবাই এখন নামাজী হয়ে গেছে। এমনকি মেয়ের মা আধুনিক শিক্ষিতা হলেও তিনি এখন আপন মেয়েকে একজন ধার্মিক ছেলের নিকট বিয়ে দেওয়ার মনস্থ করেছে। মেয়ে নিজেও মাদরাসায় পড়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে। আল্লাহ চাহেতো, আগামী রমজানের পরই সে মাদরাসায় ভর্তি হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার এবং রিফাতের জীবনের এই অভিনব পরিবর্তন আপনার বইয়ের অসিলাতেই হয়েছে। তাই আপনার নিকট আমার আকুল আরজ, আপনি এ ধরনের আরো বই লিখে আমাদের মত হাজারো মানুষকে সত্য পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করবেন। আর পাঠক-পাঠিকাদের বলছি, আপনারা 'হৃদয় গলে' সিরিজের সবগুলো বই সংগ্রহ করে পড়বেন এবং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দিবেন। পরিশেষে সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি।

মুহাম্মদ সাইফুল আলম খান
শিক্ষক, দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদ্‌রাসা, নরসিংদী।

আমি অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর একজন অকৃতজ্ঞ বান্দা। **'হৃদয় গলে'** সিরিজের তিনটি বই কোনো এক শুভ কারণে আমার হস্তগত হয়। আমি একজন মুসলিম পরিবারের সন্তান। কিন্তু মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম ফরজ কাজটি আমার দ্বারা প্রায়শই সম্ভব হয় না। তা ছাড়া অতীতে একমাত্র স্কুলে পড়া অবস্থায় ধর্ম বই পড়ে ইসলাম সম্পর্কে, হাদীস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ব্যতীত এ পর্যন্ত কোনো ভাল বই বা হাদীস আমি পড়িনি। এ পুস্তকগুলো পড়ে আমার চিন্তা হলো, কেন এ পৃথিবীতে আমার আগমন? কি উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি আমি? মহান আল্লাহ আমাকে আমার জীবনের প্রায় সকল আকাঙ্খাই পূরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর শুকরিয়া আদায় করার সময় আমার হয়নি। কত বড় অকৃতজ্ঞ আমি! এ পুস্তকগুলো পড়ে আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এখন থেকে পুস্তকে উল্লিখিত বিভিন্ন উক্তিগুলো প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ করে মেনে চলতে চেষ্টা করব। তা ছাড়া আমার মতো যারা পথভ্রষ্ট বন্ধু বা পরিচিত স্বজনগণ আছেন তাদেরকে এ সিরিজের বইগুলো উপহার দিতে চেষ্টা করব।

পরিশেষে, যার মাধ্যমে আমার নিকট এ পুস্তক হস্তগত হয়েছে সেই মহান ব্যক্তি এবং তার পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনায় শেষ করছি। আমার জন্য দোয়া করবেন। ইতি-

মোঃ রাশেদুল হক (টিটু)
১৬০ সাটির পাড়া, নরসিংদী।

আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি একজন কিতাব পড়ুয়া ব্যক্তি। আমি বাড়িতে একটি পাঠাগার দিয়েছি। আমার পাঠাগারে হাদীস, তাফসীর ও বিভিন্ন ইসলামিক বই আছে। সবই কওমী মাদ্রাসার আলিমগণের লেখা। আমি পাঠাগারের বই এলাকার সবাইকে পড়তে দেই। যারা আমার পাঠাগারের বই পড়ে তারা বলে, সুরুজ! সত্যিই তোমার বইগুলো খুবই উপকারী। একদিন আমি আমার মামার বাড়িতে গেলাম। যাওয়ার পর মামাত ভাই আমাকে **'যে গল্প হৃদয় গলে'** (২য় খণ্ড) দিল। বইটা পড়ে এত ভালো লাগল যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। পরে আমি ৫ম খণ্ড পর্যন্ত সবগুলি কিনলাম এবং সবাইকে পড়তে দিলাম। উনারা বইগুলির অতি প্রশংসা করল। **'যে গল্পে হৃদয় গলে'** ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড আমার ছোট বোন পড়ে টেলিভিশন দেখা বন্ধ করে দিয়েছে। সে বলেছে, ভাই! আমি আর টেলিভিশন দেখব না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব। আমি আশা করি, আপনার বইগুলো পড়ে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই পরিবর্তন আসবে। আমার প্রিয় ব্যক্তি মাওলানা মুফীজুল ইসলাম সাহেবকে অনুরোধ করে বলছি এমন বই আপনি আরও লিখবেন।

মীর মোঃ সুরুজ আলী
গ্রাম ও পোঃ- মুমুরদিয়া, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।

www.smfoundationbd.com

১৯ আজ বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো ছেয়ে গেছে চতুর্মুখি শত্রুতে। মুসলমানরা আজ নির্যাতিত-নিপীড়িত। পশ্চিমা দেশগুলো মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিনষ্ট করার জন্য আধাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে এবং বিভিন্ন প্রকার অপ-প্রয়াস চালাচ্ছে। তন্মধ্যে অশ্লীল বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি ও বিভ্রান্ত করছে। তাই এহেন মুহূর্তে যেমন ঈমানী জাগরণ দরকার, তেমনি দরকার "হৃদয় গলে" সিরিজের মতো বই। আমার এ জীবনে আমি বহু প্রকার বই পড়েছি, বলতে গেলে বই পড়া আমার এক প্রকার নেশা। বই ছাড়া মনে হয় জীবনটা যেন অর্থহীন। যখন "হৃদয় গলে" সিরিজের কোনো বই নিয়ে বসি, তখন এক নিমেষেই শেষ করে ফেলি। আর এ বইগুলো এমন যা বর্তমান যুগে অত্যধিক প্রয়োজন। আমি মনে করি মনোযোগের সাথে বইটি পাঠ করলে নিজের অজান্তেই অশ্রু ধারা প্রবাহিত হবে। তার প্রমাণ হলো, আমার এক উস্তাদ আমার কাছ থেকে সিরিজের চতুর্থ খণ্ডটি পড়ে বলেছিলেন, বইটি নামে যেমন, কাজেও ঠিক তেমন, সত্যিই অশ্রু ঝরে।

সবশেষে, লেখকের কাছে আমার অনুরোধ "হৃদয় গলে" সিরিজ ১০ খণ্ডে পৌছেই যেন সমাপ্ত না হয়। ক্রমাগত তা যেন চলতে থাকে। এতে করে আমাদের মুসলিম সমাজ অনেক ফায়দা লুটে নিতে পারবে। তাই দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা যেন আপনার জ্ঞানকে আরো সু-প্রসারিত করেন। আর আপনাকে নসিব করেন হায়াতে তাইয়েবা। আমীন॥

তাসনীম আক্তার (মিতু)
পাট পট্টি, নরসিংদী।

২০ আমি নাহবেমীর জামাতের একজন ছাত্র। বাংলা কোনো বই পড়তে আমার ইচ্ছে হয় না। যদিও পড়ি দুই এক পৃষ্ঠা পড়েই রেখে দেই। কিন্তু হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো এর বিপরীত। চেহারা দেখলে-ই মন ভরে যায়। পড়তে ইচ্ছে হয়। পুরো বই শেষ না করে উঠতে মন চায় না। এ ছোট জীবনে অনেক কিছুই দেখেছি নামে হলে কামে হয় না। আর কামে হলে নামে হয় না। মহান আল্লাহর শুকরিয়া মকবুল একটি নাম যে গল্পে হৃদয় গলে, যেমন নাম তেমনই কাম। বইগুলি যেন ঋতুর মতো অন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি করে। কখনো কাঁদায়, কখনো হাসায়। কখনো আমাকে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে খারাপ কাজ থেকে বাঁচার ও ভাল কাজ করার। মোট কথা, জনাব! এ বই পড়ে আমি অত্যধিক উপকৃত হয়েছি। আশা করি আপনি আরো কিতাব লিখে এ দেশের পথহারা মানুষের পথের দিশারী হবেন। দোয়া করি, এ বইগুলিকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিদায়েতের জরিয়া বানিয়ে দেন এবং আপনার নাজাতের অসিলা করে দেন। আমীন। ছুম্মা আমীন॥

হাঃ মোহাঃ যোবায়ের বিন মাওঃ আঃ কুদ্দুছ
জামাতে নাহবেমীর লালবাগ মাদ্রাসা, ঢাকা
আহবায়ক, হেফাজতে ইসলাম পাঠাগার,
ভুরুলিয়া-ডুয়েট সদর গাজীপুর।

www.smfoundationbd.com

১৯. শ্রদ্ধেয় বড় ভাই! জানি না বাংলার মধ্য প্রান্ত থেকে এ নগণ্যের দু'কলম লেখা আপনার হাতে আদৌ পৌঁছবে কিনা। ---- আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। ইসলামি বই পড়া আমার নেশা। আমার জীবনে বহু পুস্তিকা পাঠ করেছি। কিন্তু 'যে গল্পে হৃদয় গলে' ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড এর ঘটনাগুলো পড়ে আমার মনে হয় এমন চরিত্র গঠনমূলক হৃদয় বিদারক ও মর্মস্পর্শী কাহিনীর বই জীবনে পাঠ করেনি। আমি আমার শ্রেণীর বন্ধুদের কয়েকটি ঘটনা শুনানোর পর সকলে ব্যাকুল হয়ে বইগুলো সংগ্রহ করে। আমরা বইগুলো পড়ে প্রত্যেকেই উপকৃত হয়েছি। কেননা, বর্তমান যুগে টিভি, ভিসিপি ও ডিশ এন্টেনা দ্বারা মানুষের ঈমান-আকিদা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানুষের অমূল্য সম্পদ 'চরিত্র' নষ্ট হচ্ছে। ফলে ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, হাইজ্যাক, সন্ত্রাস নিত্য দিনের কর্মে পরিণত হয়েছে। তারা বলেছে বর্তমান কালে এ ধরনের বইয়ের আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত প্রয়োজন। আশা করি আপনাদের মতো কলম সৈনিকরাই পারবে পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে। আল্লাহ তা'আলা আপনার নেক হায়াত করুন এই কামনা করে শেষ করলাম। আমীন॥

সোনার ফুল রূপার পাতা, ভুল নয় আপনার কথা
টাকা পয়সা কয়েক দিন, বইগুলো চির দিন॥

মোঃ মমিনুর রহমান (শিহাব)
খতমে নবুওয়াত মাদরাসা, বি-বাড়ীয়া।

২০. সর্বপ্রথম সেই মহান প্রভুর দরবারে নত শিরে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। যিনি লেখককে ইসলামিক কিছু পুস্তক লিখে মুসলিম জাতির হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ দান করেছেন এবং আমার মতো পাঠকদেরকে তা পাঠ করে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

'যে গল্পে হৃদয় গলে' বইটির প্রতি যখন আমার দৃষ্টি পড়ে সাথে সাথেই আমার অন্তরে তা পাঠ করার আগ্রহ জাগ্রত হয়। সেই আগ্রহ নিয়ে একে একে চারটি খণ্ড পাঠ করে সমাপ্ত করলাম এবং পরবর্তী খণ্ডের অপেক্ষায় রইলাম। বইটি পাঠ করে আমি কতটুকু উপকৃত হয়েছি তা প্রকাশ করার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, এ বইগুলো পড়ে সফলতা অর্জনের একটি রাস্তা পেয়ে গেছি। শুধু তাই নয়, এ বইগুলোর প্রত্যেকটি লিখা কোরআন, হাদীস বুঝার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সুতরাং আমি সকল মুসলমানদেরকে অনুরোধ করছি, আপনারা এ বইগুলো পাঠ করে পরকালের সফলতার রাস্তা বের করার চেষ্টা করুন। সাথে সাথে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে মুহতারাম লেখককে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। লেখকের প্রতি আমার আকুল আবেদন আপনি আপনার সাধ্য অনুযায়ী আরও বই পুস্তক লিখে মুসলিম জাতিকে আখেরাতের পথ দেখানোর চেষ্টা করবেন। দোয়া করি মহান প্রভু যেন আপনাকে নেক হায়াত দান করেন এবং আপনার মেহনতগুলোকে যেন কবুল করে নেন। সাথে সাথে বইগুলোকে অছিলা করে পরকালে যেন গোটা মুসলমান জাতির নাজাতের ফয়সালা করেন। আমীন॥

সৈয়দ নাছির উদ্দীন
শশই, ইসলামপুর, বি-বাড়ীয়া।

www.smfoundationbd.com

❖ আমি একজন মাদরাসার ছাত্রী। বই পড়া আমার নেশা। জীবনে অনেক বই আমি পড়েছি। কিন্তু মনের মতো নয়। একদিন শুনলাম হুজুর একটি বই লিখেছেন যার নাম 'যে গল্পে হৃদয় গলে', বইটির নাম শুনেই আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম যে, কখন বইটা লেখা শেষ হবে। আর কখন আমি বইটা পড়ে শেষ করব। একদিন হঠাৎ আপনার বইটা এসেছে জানতে পারলাম। আমি সময় ব্যয় না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বইটি ক্রয় করে নিলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যেই বইটা পড়ে শেষ করে ফেললাম। সত্যিই আপনার হৃদয় কাড়া বইগুলো মানুষের মন পাগল করে ফেলেছে। আবার যখন বাকি খণ্ডগুলো বাহির হবে জানতে পারলাম তখন আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। হুজুরের কাছে আমার অনুরোধ রইল তিনি যেন এতটুকু লিখেই থেমে না যান। আপনার এ বই এর অসিলায় কত মানুষ যে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরে এসেছে। ওরা এতদিন অন্ধকারে ছিল, আপনার উসিলায় তারা আজ আলোর পথ খুঁজে পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আরো উচ্চ মর্যাদা দান করুক। আমীন॥

মোসাঃ আরিফা আক্তার
শেকেরচর, নরসিংদী।

❖ আমি একজন ছাত্রী। কয়েক বছর ধরে আমি মাদরাসায় লেখা পড়া করছি। ধর্মীয় বই পড়তে আমি খুব পছন্দ করি। যখন আমি শুনতে পেলাম যে, আপনার লেখা বইটি বের হয়েছে তখন আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। তাই দেরি না করে খুব তাড়াতাড়ি বইটি সংগ্রহ করে নিলাম এবং পড়তে শুরু করলাম। কয়েক দিনের মধ্যে আমি বইটি পড়ে শেষ করলাম। বইটি পড়ে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পেরেছি। এ বইটি আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় আমার মতো আরো অনেক ভাই- বোন এ বইটি পড়ে উপকৃত হবে। অন্ধকার পথ পরিহার করে আলোর পথকে বেছে নিবে। তাই আমার একটি ক্ষুদ্র অনুরোধ এই বইটির লেখক যেন ৭ম খণ্ড পর্যন্ত বের করে বসে না থাকেন। তিনি যেন আরো কয়েকটি খণ্ড বের করে মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে জান্নাতের পথের দিকে অগ্রসর করে দেন। আপনার এ বইগুলো পড়ে যেন সকলেই কামিয়াব হতে পারে এটাই আমার চির কামনা। সবশেষে লেখকের সুন্দর জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ॥

মোসাঃ মারিয়াম আখতার
মাধবদী, নরসিংদী।

www.smfoundationbd.com

✍ প্রিয় লেখক ভাইয়া! আপনার বইখানা পাঠ করে এক দিকে যেমন আমি নিজে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি ঠিক তেমনি এর দ্বারা তালিমের মাধ্যমে অনেক মহিলাদেরকে সুপথে আনার সুযোগ হয়েছে। তালিমের মহিলারাও বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছে। আমার বিশ্বাস, এ বইটি যে ব্যক্তি আমলের নিয়তে পাঠ করবে, তার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসবে। দোয়া করি আপনার বইখানা পড়ে আমি যেমন উপকৃত হয়েছি তেমনি হাজারও মেয়ে আমার মতো সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়ে সত্য ও সুন্দরের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। আমীন॥

আমাতুল্লাহ্ সালেহা (সালমা)
বেগুনাই, লাখাই, হবিগন্জ।

✍ প্রিয় লেখক! আমি দারুল উলূম হাটহাজারীর একজন ছাত্র। গত ক'দিন আগে আমার এক ভাইকে আমার পাশে হৃদয় গলে সিরিজ-৪ পড়তে দেখি। আমি তার কাছ থেকে বইটি এনে দু'টি ঘটনা পড়ার পর সে আমার কাছ থেকে বইটি নিয়ে নেয়। পরে তার কাছে ২য় বার বইটি চাইতেই সে বিভিন্ন কথা বলে কেটে পড়ে। ঘটনা দু'টি পড়ে আমি এত আনন্দ পেয়েছি যে, মনে হয়েছিল বইটি তখনই শেষ করি। কিন্তু সাথী ভাইয়ের এ ধরনের ব্যবহার করাতে মনে খুব আঘাত পেলাম। তাই ২য় বার তার কাছে না চেয়ে সাথে সাথে আপনার মোবারক হাতের লিখা হৃদয় গলে সিরিজের সবগুলো বই সংগ্রহ করে পড়তে বসলাম। পড়তে পড়তে মনে হলো, আমি যেন অন্য জগতে চলে গেলাম। আপনার বইগুলো পড়ে আমি সীমাহীন আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছি। তবে আমার চেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছে আমার বোনেরা। তারা পড়ার পর বলেছে ভাইয়া! তুমি আমাদেরকে এর বাকি বইগুলো এনে দাও। আপনার কাছে আমার হাত জোড় করা অনুরোধ কষ্ট হলেও হৃদয় গলে সিরিজের আরো কিছু বই বের করে আমাদের বুকভরা আশা পূরণ করবেন। ভাই! বিশ্বাস করবেন কি না জানি না জীবনে অনেক বই কিনেছি এবং পড়েছি কিন্তু কোনো বই পড়েই এত আনন্দ ও উপকার পাইনি যা হৃদয় গলে সিরিজ পড়ে হয়েছে। এতে যেন যাদুমাখা রয়েছে। আমার পাঠ্য জীবনে এ বই কিনা এবং পড়ার ঘটনাটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মোঃ আব্দুল মমিন
গ্রাম-উঃ পঃ রাজার গাঁও, চাঁদপুর।

==== সমাপ্ত ====

'হৃদয় গলে' সিরিজ তাদের জন্য .....

- যারা বিভিন্ন মানবীয় গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করে একটি আদর্শ ও মধুময় জীবন গঠনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন।
- যারা স্বীয় সন্তান কিংবা অন্য কোন আপনজনকে চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য কোন ভাল বই তালাশ করছেন।
- যারা চরিত্র গঠনমূলক, হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী কাহিনী পড়তে ভালবাসেন।
- যারা প্রিয়জনকে এমন কোন অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিতে চান যা উপহার গ্রহীতাকে কেবল খুশিই করবে না, হৃদয়ের খোরাকও যোগাবে।
- যারা নিষ্প্রেজ হয়ে পড়া ঈমানী চেতনাকে শানিত করতে চান।
- যারা স্বীয় পাঠাগারগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ-মানের বই দ্বারা সমৃদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
- যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার প্রদানের জন্য ভাল বই খুঁজে বেড়াচ্ছেন।
- যারা নিজেদের ভাষণ বক্তৃতাগুলোকে আরো তেজোদীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার মাধ্যমে মুসলমান নর-নারীদের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

একটি বিশেষ অনুরোধ

'পাঠকের মতামত' বিভাগে লেখা পাঠানোর পূর্বে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করে বলছি-আপনারা লেখক বরাবর চিঠি লেখার আগে একটু কষ্ট করে এই বইয়ের শুরু ভাগে লিখিত 'পাঠকের খেদমতে দু'টি জরুরী কথা' অংশটুকু অবশ্যই পড়ে নিবেন। ---- লেখক।

আল্লাহ্‌প্রেম, আত্মশুদ্ধি ও জীবন গঠনের লক্ষ্যে আমাদের প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ

- তাফসীরে আমপারা
- আখলাকুন নবী ﷺ
- নবী অবমাননার শরয়ী বিধান
- রাসূলের (ﷺ) গৃহে একদিন
- কেমন ছিলেন রাসূল ﷺ?
- আউলিয়ায়ে কেরামের সিয়াম সাধনা
- রমজানের আধুনিক জরুরি মাসায়েল
- আদর্শ শিক্ষক রাসূল ﷺ
- আদর্শ সন্তান
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইলমে হাদীস
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্মারকগ্রন্থ
- আলোকিত জীবনের সন্ধানে [১ম ও ২য় খণ্ড]
- দাওয়াত ও তাবলীগের রূপরেখা
- ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা
- কুরআন আপনাকে কী বলে?
- কুরবানির ইতিহাস ও মাসআলা-মাসায়েল
- কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি (১ম-৩য় খণ্ড)
- মহিয়সী নারীদের দিনরাত
- ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ
- তাকবিয়াতুল ঈমান
- কিয়ামত কবে হবে
- তওবার বিস্ময়কর ঘটনা
- বেহেশতী জেওর বাংলা [১ম-৫ম]
- বেহেশতী জেওর বাংলা [৬ষ্ঠ-১০ম]
- বিশ্ব কবিদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ
- বিপদ কেন ও মুক্তি কোন পথে?
- মাযহাব মানি কেন?
- মাসায়েলে মাইয়্যিত
- মুসলিম রমণী
- রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ ﷺ [১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড]
- শবে বরাত ও শবে কদর : করণীয় বর্জনীয়
- আত্মীয়-স্বজনের হক ও হুকুকুল ইবাদ
- সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম
- আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের অজিফা
- চির অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায়

উপন্যাস

- গুমরে মরি একলা ঘরে
- বেলা অবেলার মঞ্চ

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩৩/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com